আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

Love for all
Hatred for none

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Fortnightly Ahmadi

নব পর্যায় ৭৭ বর্ষ | ১১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ পৌষ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ | ২১ সফর, ১৪৩৬ হিজরি | ১৫ ফাতাহ্, ১৩৯৩ হি. শা. | ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে

২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর টানা ৪ দিন ব্যাপী

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

বিস্তারিত ভিতরের পাতায়

যশোরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের নির্মিত মসজিদ 'মসজিদে মাহমুদ'

বিস্তারিত পড়ুন ৪৬ পৃষ্ঠায়

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন-
"তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই অধীনস্থদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হতে হবে ।"

(বুখারী ও মুসলিম) ।

"বাহ্যিকতার কোন মূল্য নেই । খোদা তোমাদের হৃদয় দেখে থাকেন এবং তদনুযায়ী তিনি তোমাদের সাথে ব্যবহার করবেন ।"

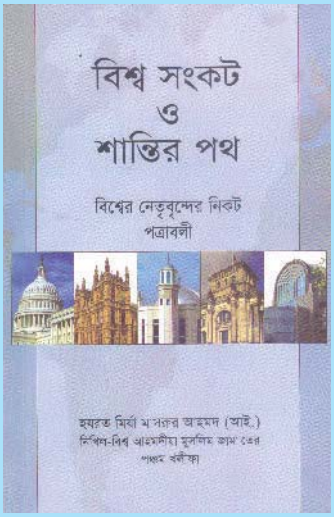

-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ (আই.) বিশ্ব সংকট নিরসন ও শান্তির জন্য বিশ্বের নেতৃবৃন্দের নিকট যে সব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার বাংলা অনুবাদ **'বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ'** পুস্তক আকারে বের হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **ড. আবদুল্লাহ শামস বিন তারেক**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে। **আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।**

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

সূচিপত্র

১৫ ডিসেম্বর, ২০১৪

কুরআন শরীফ	৪
হাদীস শরীফ	৫
অমৃত বাণী	৬
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদত্ত ১লা জুন, ২০০৭-এর **জুমুআর খুতবা**।	৭
কলমের জিহাদ মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৫
যুগ ইমামের সাথে মুলাকাত ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১৮
হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর নামে দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর লেখা পত্র	২১
ইসলামের সাথে জীবনের সম্পর্ক মাহমুদ আহমদ সুমন	২৩
দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি- **দরবেশ মওলানা আব্দুল মোতালেব** মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	২৬
গিবত একটি জঘন্য পাপ মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন	৩১
নবীনদের পাতা- হিন্দুধর্মে কলিযুগ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ	৩৩
অনুভূতির জলসা নিউজিল্যান্ড ফারজানা আক্তার (ঊষা)	৩৫
দৃঢ়তা সম্পর্কে কিছু কথা রেজোয়ানা করিম রোদেলা	৩৬
পাঠক কলাম- "সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা" মিলা পাটোয়ারী, নীলিমা পারভেজ, ইসমত আরা চৌধুরী (উর্মি), আনোয়ারা বেগম, মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, মৌ. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান	৩৭
সংবাদ	৪১
আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ	৪৪
যশোরে আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন	৪৬
সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠান সূচি	৪৮

কাদিয়ান দারুল আমান-এর
১২৩তম সালানা জলসা
মুবারক হউক।

আগামী ২৬, ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪, ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ১২৩তম সালানা জলসা। লন্ডন থেকে সরাসরি জলসার সমাপ্তি বক্তব্য ও দোয়া পরিচালনা করবেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)। জলসায় অংশগ্রহণকারী সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ। সেই সাথে জলসার সফলতার জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

-সম্পাদক

সম্পাদকীয়

এক ঐশী তাহরীক–
ওয়াকফে জাদীদ

ওয়াকফে জাদীদ তাহরীক বা আন্দোলন আহমদীয়া মুসিলম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা আল মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) প্রবর্তন করেছেন। যা এখন চিরস্থায়ী এক কল্যাণময় রূপ পেয়েছে। ওয়াকফে জাদীদ চাঁদার বছর শুরু হয় ১লা জানুয়ারী থেকে আর শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বরে। মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় এ তাহরীকের কল্যাণে আজ সারা বিশ্বে লাখো-লাখো পথহারা মানুষ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হয়ে সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছে।

ওয়াকফে জাদীদ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের শেষ তাহরিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক আসমানী তাহরীক। এই অবক্ষয়ের যুগে সকলকে অবক্ষয়মুক্ত করতে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে প্রেরণ করেছেন।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যুগ ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের সুদূরপ্রসারী আধ্যাত্মিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আধ্যাত্মিক নেতা হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ওয়াকফে জাদীদের স্কীম চালু করেন। এই তাহরীকের অধীনে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বেশী-সংখ্যা শিক্ষক তৈরী করা, যাতে জামা'তের মধ্যে কুরআনের শিক্ষাদান বাধাগ্রস্থ না হয়। আর এসবের জন্য আর্থিক কুরবানির প্রয়োজন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার আগমনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুনিয়ার মানুষকে বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)- এর প্রতি নাযিলকৃত আল্লাহ্‌র বাণী অনুসরণ করে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। আর এ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার লক্ষ্যে ওয়াকফে জাদীদের স্কীম চালু করে হযরত মির্যা মাহমুদ আহমদ (রা.) আমাদেরকে আর্থিক কুরবানির সুযোগ করে দিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সৌভাগ্যের কারণ। আলহামদুলিল্লাহ্!

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ওয়াকফে জাদীদ স্কীমের আওতায় গ্রামাঞ্চলে কুরআন শরিফের তালিমে জামা'তের শিশু-কিশোরদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে এর ভিত্তি রেখেছিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) চেয়েছিলেন জামা'তের একদল নিবেদিতপ্রাণ যুবক– যারা বাড়ি ঘর আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে দূরে কোথাও সুফিয়ায়ে কেরাম, আউলিয়ায়ে কেরামের মত ইসলাম ও কুরআনের আলো ছড়াবার জন্য জীবন উৎসর্গ করবে।

সে সময়ে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছিলেন, আজও এমনই এক সময় যখন আমাদের যুবকেরা যাদের অন্তরে আত্মত্যাগ ও কুরবানির প্রেরণা আছে, যারা নিজেদের ঘর-বাড়ি ছেড়ে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে অন্য অঞ্চলে গিয়ে সেখানে নিজেদের জন্মস্থানের মত করে বসবাস করবে। আস্তে-আস্তে আশেপাশের এলাকায় ইসলামের আলো বা ঈমানের আলো ছড়াবে। তারা নিজেকে আমার সমীপে ওয়াকফে করবে। আমার মতে এটা কোন অসম্ভব কাজ নয়। আমার মাথায় স্কীম আসছে। এমন যুবকরা তাহরীকে জাদীদের আওতায় নয় বরং সরাসরি আমার সমীপে ওয়াকফ করবে। আমার নির্দেশ মত কাজ করবে। আমি মনে করি, আজ ধর্মের সেবায় এটি একটি বিরাট সুযোগ। (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়া, ৬ ফেব্রুয়ারি-১৯৫৭)।

ওয়াকফে জাদীদ প্রথমত কেবল পাকিস্তান, হিন্দুস্থান ও বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত ছিল। পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সনে এ স্কীমকে সারা পৃথিবীতে প্রসারিত করে দিয়েছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে বলেছিলেন, ওয়াকফে জাদীদ মোয়াল্লেমদের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কম পক্ষে দুইশ' গ্রামে (সিন্দু প্রদেশে)– যেখানে সবাই হিন্দু ছিল এখন সেখানে কয়েক হাজার আহমদী মুসলমান আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ঘোষণা করছে এবং হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর প্রতি দুরুদ পাঠ করছে। এজন্য কেবল টাকার প্রয়োজন নয় বরং নিবেদিতপ্রাণ উৎসর্গকারী মোয়াল্লেমীনেরও প্রয়োজন। (আল ফযল, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪)।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বর্তমানে হাজার-হাজার ওয়াকফে জিন্দেগী এ তাহরীকের অধীনে কাজ করছেন। এজন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। ওয়াকফে জাদীদের বর্তমান বছরটি ৩১ ডিসেম্বর শেষ হতে যাচ্ছে। মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে ওয়াকফে জাদীদ এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এ খাতে বেশি বেশি আর্থিক কুরবানী করার পাশাপাশি নিজেদেরকে এই তাহরীকে সম্পৃক্ত করে কুরআনী শিক্ষার আলোয় জীবন গড়তে সর্বদা অগ্রনী ভূমিকা রাখারও তৌফিক দান করুন, আমীন।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে
গৌরবোজ্জল ১৬ ডিসেম্বর

আবার ফিরে এসেছে বিজয়ের মাস ডিসেম্বর। বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জল দিন ১৬ ডিসেম্বর-মহান বিজয় দিবস। ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মদানে মুক্ত স্বদেশে আজ উদযাপিত হতে যাচ্ছে বিজয়ের ৪৪তম বার্ষিকী। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় ঢাকার ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে হর্ষোৎফুল্ল এক বিশাল জনতার সামনে, আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর করেন পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী। পাকবাহিনীর এই আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষরদান মানেই তো যুদ্ধের বিজয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিজয়ের স্মারক হিসেবে ১৯৭২ সাল থেকেই আমরা প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর 'বিজয়' দিবস পালন করে আসছি। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে এরকম দ্বিতীয় আর কোন বিজয় দিবস নেই।

আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর আমাদের বিজয় দিবসকে স্মরণ করে। এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে তা বিশ্ববাসী উপলব্ধি করতে পারছে আজ।

সমগ্র জাতি এই মাসে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অতুলনীয় সাহস ও আত্মত্যাগের কথা, দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধে যারা পরাক্রমশালী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীনতার সূর্য পতাকা ছিনিয়ে এনেছিল। ঐ বিজয়ের পিছনে

ছিল কোটি কোটি মানুষের দৃঢ় প্রত্যয় ও অকুণ্ঠ সমর্থন। আজ আমাদের হৃদয় গর্বে ভরে যায়, পৃথিবীর সকল দেশের জনগণ প্রতি বছর আমাদের বিজয় দিবসকে স্মরণ করে। এ নদী বিধৌত পলি মাটির মনুষ্যত্ব আর গণতান্ত্রিক সমর্থনে সাধারণ মানুষ কতটা নিবেদিত প্রাণ ও দেশ প্রেমিক হতে পারে এবং কতটা আত্মত্যাগী হতে পারে তা বিশ্ববাসী উপলব্ধি করতে পারছে আজ। ভাষা সৈনিক সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার এর আত্মদান আর একাত্তরের ৩০ লাখ শহীদ ও তিন লাখ মা বোনের ইজ্জত হারানো শাশ্বত এ বাঙ্গালীর রক্তের ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠা বাংলাদেশ, আজ বিশ্ব-দরবারে স্বীয় মর্যাদায় মাথা উঁচু করে নিজ অস্তিত্বে দেদীপ্যমান। আমরা চাই যে লক্ষ্যে এদেশকে আমরা স্বাধীন করেছি তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন। আজ সময়ের দাবী সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শানিত করে সকল অন্ধকার শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এই স্বাধীনতার মূল্যবোধকে সব কিছুর উর্ধ্বে তুলে ধরি। তবেই না আমাদের এই বিজয় দিবস পালন স্বার্থক হবে।

বিজয় দিবসের আনন্দ হোক চির অম্লান
জয় হোক চির সত্যের

কুরআন শরীফ

সূরা আল হিজ্‌র-১৫

قَالُوْا بَشَّرْنٰكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقٰنِطِيْنَ ﴿٥٦﴾

৫৬। তারা বললো, 'আমরা কেবল সত্যের ভিত্তিতেই তোমাকে সুসংবাদ দিয়েছি। সুতরাং তুমি হতাশাগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ো না।'

قَالَ وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖٓ اِلَّا الضَّآلُّوْنَ ﴿٥٧﴾

৫৭। সে বললো, 'পথভ্রষ্ট ছাড়া নিজ প্রভু-প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে আর কে হতাশ হতে পারে?'

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٨﴾

৫৮। সে বললো, 'হে প্রেরিতরা![১৫০৬] তোমাদের (আসল) উদ্দেশ্য কী?'

قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿٥٩﴾

৫৯। তারা বললো, 'নিশ্চয় আমরা এক অপরাধী জাতির উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি,

اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ اِنَّا لَمُنَجُّوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٦٠﴾

৬০। তবে লুতের অনুসারীদের কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তাদের সবাইকে আমরা উদ্ধার করবো,

১৫০৬। কুরআন করীমে 'আলমুরসালুন' শব্দ ব্যবহার দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করছে যে সংবাদবহনকারী ব্যক্তিগণ ছিলেন মানব। বাইবেল অবশ্য তাদেরকে কখনো মানুষ (আদি ১৮ঃ২, ১৬, ১২), আবার কখনো ফিরিশ্‌তা বলে অভিহিত করেছে (আদ ১৯ঃ১১, ১৫)।

হাদীস শরীফ
পরিপূর্ণ জীবনের জন্য তাকওয়া হলো পাথেয়

কুরআন :

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।'

(সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

হাদীস :

আন আনাসিন (রা.) ইন্নাকুম লাতা'লামুনা আ'মালান হিয়া আদাককু ফী আ'ইউনিকুম মিনাশ্‌ শা'রে কুন্না নাউদ্দুহা আলা আহদে রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামা মিনাল মু'বিকাতে (বুখারী)।

অর্থাৎ আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তোমরা এমন সবকাজ করে থাকো যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল হতেও নগণ্য। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর যুগে সেগুলোকে ধ্বংসকারী তুচ্ছ হিসেবে গণ্য করতাম (বুখারী)।

ব্যাখ্যা :

ইসলাম আমাদের জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করতে চায়। পরিপূর্ণ জীবনের জন্য তাকওয়া হলো পাথেয়। তাক্‌ওয়াবিহীন জীবন অসফলতার প্রতীক। মানুষ প্রতিনিয়ত পাপ করে যাচ্ছে। আর এর কারণ হলো, মানুষ এসবকে তুচ্ছ মনে করে। যার মাঝে তাক্‌ওয়া আছে, সে তার কোন কর্মকে খাটো করে দেখে না। বরং তার কর্ম সে খোদার সন্তুষ্টির মাপকাঠিতে মেপে দেখে।

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর যুগে ছোট ছোট বিষয়কেও প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা ঐ সকল খোদার সন্তুষ্টির মাপ কাঠিতে মেপে দেখেছেন। সালাম দেওয়া, প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার, মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার, হাস্যবদনে সকলের সাথে সাক্ষাৎ করা এমন সব বিষয়কে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু আজ আমরা এ সকল বিষয়ের দিকে ফিরেও তাকাতে চাই না। যার সাথে যেমন ইচ্ছা ব্যবহার করলাম এটাও তাক্‌ওয়ার পরিপন্থী।

আল্লাহ্‌ তা'লা করুন আমরা সবাই যেন আমাদের আমলের দিকে তাকাই ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকেও যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বড়, গুরুত্ব দিয়ে আমল করি, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্‌ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

সে ধর্ম- ধর্মই নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই সে মানুষ- মানুষই নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে আমার সর্বশক্তিমান খোদা! হে আমার প্রিয় পথ-প্রদর্শক! তুমি আমাকে সে পথ দেখাও, যে পথে নিষ্ঠাবান ও নির্মল হৃদয়ের লোকগণ তোমাকে পেয়ে থাকেন এবং আমাদেরকে ঐ সকল পথ হতে রক্ষা কর যার লক্ষ্য কেবল কামনা-বাসনা বা বিদ্বেষ, হিংসা বা পার্থিব লোভ-লালসা।

অতঃপর হে শ্রোতাগণ! শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই আমরা ঐ খোদার প্রতি বিশ্বাস আনার ক্ষেত্রে অংশীদার, যিনি পৃথিবীর স্রষ্টা ও অধিপতি। এরূপেই আমরা মানুষ নাম ধারণের ক্ষেত্রেও অংশীদার, অর্থাৎ আমাদের সকলকেই মানুষ বলা হয়। তদ্রূপেই একই দেশের অধিবাসী হওয়ার দরুনও আমরা একে অন্যের প্রতিবেশী। তাই নির্মল হৃদয় ও শুভেচ্ছার সাথে আমাদের একে অন্যের বন্ধু হয়ে যাওয়া কর্তব্য। তাছাড়া ধর্মীয় ও পার্থিব বিপদাপদে একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানো উচিত এবং এরূপ সহানুভূতি দেখানো উচিত যেন একে অন্যের দেহের অংশ হয়ে যাই।

হে স্বদেশবাসীগণ! সে ধর্ম- ধর্মই নয়, যাতে সাধারণ সহানুভূতির শিক্ষা নেই এবং সে মানুষ-মানুষই নয়, যার মধ্যে সহানুভূতির গুণ নেই। আমাদের খোদা কোন জাতির মধ্যে পার্থক্য করেন নি। উদাহরণস্বরূপ, যে সমস্ত মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতা আর্যাবর্তের আদিম জাতিদেরকে দেয়া হয়েছিল, ঐ সমস্ত শক্তিই আরব, পারস্য, সিরিয়া, চীন ও জাপানের অধিবাসীদেরকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলোকেও দেয়া হয়েছে। সকলের জন্য খোদার জমীন বিছানার কাজ করছে। সকলের জন্য তাঁর সূর্য, চন্দ্র ও আরো অনেক নক্ষত্র উজ্জ্বল প্রদীপের কাজ করছে এবং অন্যান্য সেবাও করছে। তাঁর সৃষ্ট জড়-প্রকৃতি, অর্থাৎ বায়ু, পানি, আগুন, মাটি এবং তেমনিভাবেই তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য সকল বস্তু যথা শাক-সব্জি, ফল, ঔষধ ইত্যাদি থেকে সকল জাতি উপকৃত হচ্ছে। অতএব, আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের এ সকল রীতি এ শিক্ষাই দিচ্ছে আমরাও যেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের প্রতি সৌজন্য ও সৌহার্দ্য দেখাই এবং অনুদার ও সঙ্কীর্ণমনা না হই।

বন্ধুগণ! নিশ্চয় জানবেন, যদি আমাদের দু'জাতির কোনও জাতি খোদার গুণের সম্মান না করে এবং নিজেদের আচার-আচরণ তাঁর পবিত্র গুণাবলীর বিপরীত গঠন করে তবে সেই জাতি শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা কেবল নিজেরাই ধ্বংস হবে না, বরং নিজেদের বংশধরকেও ধ্বংস করে দেবে। যখন থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে সকল দেশের সাধু পুরুষগণ এ সাক্ষ্য দিয়ে আসছেন যে, খোদার গুণের অনুসরণকরী হওয়া মানুষের স্থায়িত্বের জন্য এক জীবন সুধা। খোদার সকল পবিত্র গুণের অনুসরণ মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে জড়িত। এটাই শান্তির উৎস।

(পয়গামে সুলেহ্, বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ৫-৬)

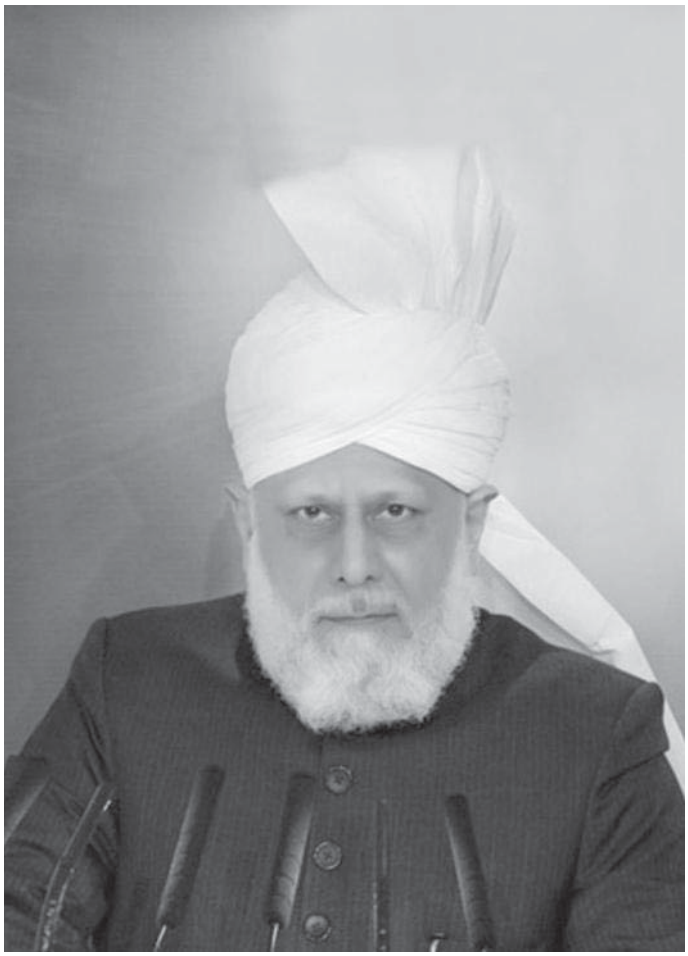

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১লা জুন, ২০০৭-এর জুমুআর খুতবা।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا ۝

(সূরা আন নিসা: ৩৭)

এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না এবং সদয় ব্যবহার করো পিতা-মাতার সাথে এবং আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সহচর ও পথচারীদের সাথে আর তোমাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে তাদের সাথে। আল্লাহ্ অহংকারী ও দাম্ভিককে আদৌ ভালোবাসেন না। (সূরা আন নিসা: ৩৭)

গত খুতবায় গৃহে সালামের প্রচলন এবং শান্তির বাণী পৌঁছানোর বরাতে কথা বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌র শান্তির বাণী পৌঁছানোর ফলেই গৃহে শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সব শান্তির উপহারের ফলে শান্তির প্রস্রবন প্রবাহিত হবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এবং শান্তির বার্তা পৌঁছানোকারী স্বয়ং নিজের জন্যও এই 'দারুস সালাম' এর দ্বার উন্মুক্ত করে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় নিজ গৃহবাসীদের জন্যও এই দ্বার খুলেন। যেভাবে আমি বলেছিলাম, ইসলামের এই শান্তির বাণীই আর্থ-সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক শান্তির বার্তা।

আমি গত খুতবায় আপনাদের গৃহে আর আপনাদের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের গৃহে এই অতীব সুন্দর বাণী পৌঁছানোর আল্লাহ্ তা'লা যে নির্দেশ আমাদের

দিয়েছেন তা বর্ণনা করেছিলাম। যার ফলে শান্তি ও সন্ধির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত করে অন্যদেরকে সব ধরণের অন্যায়-অবিচার থেকে নিরাপদ রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বলেছিলেন। আমি যে আয়াত পাঠ করেছি তা সূরা নিসার ৩৭ নাম্বার আয়াত। এতেও আল্লাহ্ তা'লা যদিও সরাসরি নয় তথাপি সহানূভুতির আলোকে যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন, এরূপ করো। এর মাধ্যমে বিশ্বে শান্তির বার্তা পৌঁছায় আর প্রত্যেক সেই শ্রেণীর কাছে পৌঁছায় যার কথা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যদি একজন মানুষ, একজন মুসলমান ও একজন মু'মিন এর ওপর আমল করে তাহলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এই একটি আয়াতে ভালোবাসা, শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এগারটি দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে যার ওপর আমল করে খুব সুন্দর একটি সমাজ জন্ম লাভ করতে পারে যা সমাজকে শান্তির সুগন্ধিতে সুরভিত করবে।

এক্ষেত্রে প্রথমে যে কথা বলা হয়েছে তাহলো, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করো, সেই বিষয় যা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের সাথে সম্পর্ক রাখে তা হলো, ইবাদত করো আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। বলা হয়েছে,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا

একজন মুসলমান তখনই মুসলমান বলে বিবেচিত হবে যখন ইসলামের এই মৌলিক উদ্দেশ্য অনুধাবনকারী হবে, যে জন্য মানব সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা এই উদ্দেশ্য অর্জন ছাড়া ইসলামের সত্যিকার চেতনা সৃষ্টি করা যেতে পারে না। খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্যের বুৎপত্তি লাভ করতে পারে না আর একজন মানুষও মু'মিন 'আস্‌সালাম' বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত না হবার কারণে তার কল্যাণমালা থেকে আশিসমন্ডিত হতে পারে না। তাই এই মৌলিক শিক্ষাকে প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের দৃষ্টিতে রাখতে হবে যাতে শান্তির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে স্বয়ং এথেকে কল্যাণমন্ডিত হয় আর নিজ সমাজকেও এর আলোকে কল্যাণ পৌঁছাতে পারে। যখন এই সত্যকে অনুধাবন করবে, যখন এই উদ্দেশ্যকে নিজ জীবনের উঠা-বসায় পরিণত করবে তারপর বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকার প্রদানের চেষ্টা করো, তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করো, যা এ আয়াতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, তোমরা পরস্পরের সাথে যে সদ্ব্যবহার করো এটি সমাজে শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

পরিশেষে যে বিষয়ের প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে আর বান্দার প্রাপ্য প্রদানের সাথেও। এখন একে একে আমি সে সকল নির্দেশগুলো যা সমাজের সকল শ্রেণীর মাঝে শান্তি, নিরাপত্তা এবং প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

প্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "ওয়াবিল ওয়ালি দায়নি ইহসানা" অর্থাৎ পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার আর ইহসান করো। এটি এদিকে মনযোগ আকর্ষণ করে যে, খোদা তা'লার ইবাদতের পর সকল অনিষ্ট থেকে পিতা-মাতাকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের সব ধরণের চেষ্টা করা প্রয়োজন কেননা তাঁরাও তোমাদেরকে শিশুকালে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তোমাদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার জন্য তোমাদের পিতামাতারাই কষ্ট সহ্য করেছেন। আজ বড় হয়ে তোমাদের ওপর দায়িত্ব বর্তায় যে, তাদের অধিকার প্রদান কর। একস্থলে বলেছেন, যদি তারা বার্ধ্যক্যে পৌঁছে তাহলে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলবে না, তাদের কথা মান্য করো। অন্যত্র বলেন,

وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا

(সূরা বনী ইস্রাঈল:২৫) এ দোয়াও এজন্য যে, তোমাদের আবেগ-অনুভূতি এবং চিন্তা-চেতনা তাদের জন্য দয়ার পথসমূহ এবং এটি আবার উভয় পক্ষের দোয়া পরস্পরের প্রতি শান্তি বর্ষিতকারী হয়। আরেক স্থলে আল্লাহ্ তা'লা পিতামাতার সাথে অনুগ্রহের আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আর কৃতজ্ঞতা

"আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত, পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, এতীম ও মিসকীন, প্রতিবেশী, মুসাফির এবং অধিনস্তদের সাথে কুরআনী শিক্ষার সূত্রে জামা'তের সদস্যদেরকে সদ্ব্যবহার করার গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ।"

প্রকাশকারী বান্দা হবার উল্লেখ করেছেন।

বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦﴾

(সূরা আল্ আহ্‌কাফ্:১৬)

এবং আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছি, কারণ তার 'মা' তাকে কষ্টের সাথে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে প্রসব করেছে এবং তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস সময় লেগেছে। অতঃপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পদার্পণ করে, তখন সে বলে 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তৌফিক দান কর যাতে আমি তোমার সেই নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দান করেছ এবং আমি যেন এরূপ সৎকর্ম করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও; এবং আমার জন্য আমার বংশধরদের মধ্যেও পূণ্য প্রতিষ্ঠিত করো। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে অবনত হয়েছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ তখনই আমি প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী হতে পারবো, সত্যিকার ইসলাম আমার মধ্যে তখনই প্রবেশ করবে, তখনই শান্তির বিস্তারকারী বলতে পারবো যখন এ সকল নির্দেশাবলীর ওপর আমল করবো। যার মধ্যে একটি নির্দেশ হচ্ছে, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের অনুগ্রহরাজিকে স্মরণ করে তাদের সাথে অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করো। সে সকল নেয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ হও। যে মানুষ এই দোয়া করে যে, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমার প্রতি কৃত সে সকল নেয়ামতের জন্য আমাকে তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বানাও। যা আল্লাহ্ তা'লা আমার ও আমার পিতা-মাতার ওপর করেছেন, যেন তাদের সন্তান-সন্ততিরা শান্তির বিস্তারকারী এবং সৎকর্মশীল হয় আর পরবর্তী প্রজন্মকেও শান্তি এবং পূণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য হে খোদা তোমার কাছেই দোয়া করছি।

এখানে পিতা-মাতাকেও এটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এখানে ঐ ধরণের পিতা-মাতার উল্লেখ করা হয়েছে যাদের সন্তানরা পূণ্যে অগ্রগামী আর সৎকর্মশীল। তাই পিতা-মাতাকে আল্লাহ্ তা'লার করুণা ভিক্ষা করতঃ তাঁর সমীপে অবনত হয়ে সন্তানদের এরূপ তরবিয়ত করা উচিৎ যারা শান্তি বিস্তারকারী হবে। যারা আত্মসমর্পণকারী হবে নতুবা এমন মা'ও ছিল যার কান অথবা জিহবা ছেলে এজন্য কেটেছিল যে, যদি সে আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতো, আমাকে শান্তি এবং অশান্তির মাঝে পার্থক্য বলতো তাহলে আজ আমা কর্তৃক সংঘটিত এই অপরাধের ফলে ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর পরিবর্তে তোমার জন্য ফযল এবং করুণার দোয়া করতো। সকল অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়া করতো।

সুতরাং পিতা-মাতাকেও তাদের দায়িত্ব অনুধাবন করতে হবে। এ আয়াতে উভয়েরই মনযোগ আকর্ষন করা হয়েছে। প্রথমে সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার অধিকার প্রদান, তাদের জন্য দোয়া করা তারপর পিতা-মাতা হিসেবে সন্তানের সংশোধন এবং পূণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য দোয়া করা। এই দোয়াসমূহই যা একজন সত্যিকার বান্দাকে বড় এবং ছোটদের অধিকার প্রদান করতঃ তাকে শান্তির বিস্তারকারী বানাবে।

এখানেই কথা শেষ হয়ে যায় না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমরা নিকটাত্মীয়দের প্রতিও খেয়াল রাখো, তাদের সাথেও অনুগ্রহসূলভ ব্যবহার করো। এরূপ সদাচরণের ফলেই তোমাদের সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে।

নিকটাত্মীয় বলতে সকল রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়। তোমাদের পিতৃ-মাতৃ উভয় কুল থেকেই। এরপরে স্ত্রী'র রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় এবং স্বামী'র রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন। উভয়ের প্রতিই এই দায়িত্ব অর্পিত হয় যে, একে অপরের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের অধিকার প্রদান করো। তাদের সম্মান করো, ইজ্জত করো।

"আল্লাহ্ তা'লার শান্তির বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছানো এটি সমাজের ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হবে"

তাদের জন্য নিজ হৃদয়ে ভালো অনুভব সৃষ্টি করো। বস্তুতঃ সে সকল অধিকার যা তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য পছন্দ করো, যে সকল নিকটাত্মীয়র সাথে তোমার ভালো সম্পর্ক আছে তাদের জন্য পছন্দ করো, কেননা নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের তারতম্য হয়ে থাকে, অনেক সময় নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কের মাঝেও ফাঁটল দেখা দেয়। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, নিজ নিকটাত্মীয়দের সাথেও সদ্ব্যবহার করো আর কেবল তাদের সাথেই নয় যাদের সাথে ভালো সম্পর্ক রয়েছে, যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো বরং যাদেরকে তোমরা পছন্দ করো না, যাদের যাথে তোমাদের মতপার্থক্য রয়েছে তাদের সবার সাথেই সদ্ব্যবহার করো। সকল নিকটাত্মীয়ের সাথেই সদ্ব্যবহার করতে হবে। যেভাবে আমি বলেছি, কেবল তাদের সাথে নয় যাদের সাথে মতের মিল রয়েছে বরং সবার সাথে। বরং নির্দেশ হচ্ছে, কেবল নিজের আপন আত্মীয়-স্বজনের সাথেই নয় বরং পুরুষের জন্য স্ত্রী'র এবং মহিলার জন্য তার স্বামী'র আত্মীয়-স্বজনের সাথেও উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। এরূপ ব্যবহারই আল্লাহ্ তা'লার শান্তির বার্তার পাশাপাশি শান্তির বিস্তারকারী হবে।

গৃহে এ কারণে বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ হয় যে, একে অপরের আত্মীয়-স্বজনের সম্মান ও সমাদর করে না। স্বামী-স্ত্রী'র সবচেয়ে আপন আত্মীয় হচ্ছে তাদের পিতা-মাতা। যেখানে নিজ পিতা-মাতার সাথে অনুগ্রহসূলভ ব্যবহারের নির্দেশ সেখানে স্বামী-স্ত্রী'কে পরস্পরের পিতা-মাতার প্রতিও সদ্ব্যবহার করার আদেশ রয়েছে। অনেক সময় স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রী'র পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনকে ভালোমন্দ বলে বসে আবার অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী'রা স্বামীদের পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনকে ভালোমন্দ বলে থাকে। আহমদী সমাজে যেখানে আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ হচ্ছে শান্তির প্রসার ঘটাও। সেখানে এগুলো ঘটা উচিত নয়। এছাড়াও আমরা যুগ ইমামকে মেনেছি আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে উন্নত গুণাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার রীতি-পদ্ধতিও শিখিয়েছেন। এটিও বলেছেন, যদি আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে চাও তাহলে সে সকল উন্নত গুণাবলী ধারণ কর যার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল।

আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার পরে যেহেতু আমাদেরকে এ জন্য বিরোধীতার সম্মুখিন হতে হচ্ছে যে, কেন তোমরা এই ব্যক্তিকে মেনেছ যিনি নিজেকে মসীহ্ মাওউদ ও আল্লাহ্‌র নবী বলে দাবী করে। আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর অনেককে তাদের আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকেও অনেক কষ্ট পেতে হয়। আপন জনেরাও সম্পর্ক ছিন্ন করে। পিতারা তাদের সন্তানদের ওপর কঠোরতা করে আর ঘর থেকে বের করে দেয়। এজন্য বের করে দেয় যে, কেন তুমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছ। এ অবস্থায় একজন আহমদীকে কতটুকু তার সম্পর্ককে পবিত্র রাখা উচিত। প্রত্যেককে এটি চিন্তা করা উচিত যে, খোদা তা'লা যার নাম রেখেছেন শান্তির যুবরাজ সেই ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের দাবী করার পর আমাদের কত বেশি শান্তির বিস্তার করা এবং সম্পর্ক দৃঢ় করার চেষ্টাকারী হওয়া প্রয়োজন।

আহমদীকে নিজের মাঝে এই চেতনা সৃষ্টি করা প্রয়োজন, আমরা যেন শান্তির যুবরাজের নামের ওপর কোন কালিমা লেপনকারী না হই। যদি আমরা সম্পর্কের দাবী পূরণ করি, তাদের সাথে সদয় আচরণ করি, তাদের জন্য দোয়া করি আর তাদের কাছ থেকে দোয়া লাভকারী না হই তাহলে এদের সাথে কিভাবে সদয় আচরণ করতে পারবে। তাদের সাথে কিভাবে ইহসানের সম্পর্ক বৃদ্ধি পেতে পারে। তাদের কিভাবে খেয়াল রাখবে যাদের সাথে রক্তের সম্পর্কও নেই।

বিভিন্ন কর্মকর্তার ব্যাপারেও অভিযোগ উঠে থাকে যে, স্ত্রী-সন্তানদের সাথে সদ্ব্যবহার করে না। পূর্বেও আমি বলেছি। এধরণের অত্যাচারের সংবাদ অনেক সময় এত বেশি আসতে থাকে যে, উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি বিপ্লব সাধন করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন আর অনেকে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বরং জামাতী দায়-দায়িত্ব পালন করা সত্বেও। অনেকে জামাতী কাজ-কর্মে বেশ অগ্রগামী তথাপিও কিভাবে নিজ গৃহবাসীদের ওপর অত্যাচার করে। আল্লাহ্ দয়া করুন আর ঐ সকল লোকদের বিবেক দিন। এ ধরণের মানুষ যখন সীমাতিক্রম করে যুগ খলীফার কানে কথা পৌঁছে তখন তাদেরকে জামাতী দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। তারপর উচ্চকিত হয় যে, আমাদেরকে জামাতী দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, এটি পূর্বে চিন্তা করা উচিত যে, একজন কর্মকর্তা হিসেবে আমাদেরকে কুরআনের নির্দেশাবলীর ওপর কত বেশি আমল করা উচিত। শান্তির বিস্তারের জন্য আমাদেরকে কত বেশি চেষ্টা করা প্রয়োজন।

এরপর এ আয়াতে আরেকটি নির্দেশ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এতীমদের সাথেও অনুগ্রহ সূলভ আচরণ কর কেননা এরা সমাজের দূর্বল শ্রেণী, তাদের সাহায্যকরার কেউ নেই। যদি তাদের ওপর অত্যাচার হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে কথা বলার কেউ নেই, তারপর অনেক সময় এরূপ হয় যে, এই দূর্বল শ্রেণীর প্রতিক্রিয়া পরবর্তীতে বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়। প্রথমে ছোট-খাট বিষয় এবং অপরাধে জড়িত হয়, নিজের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা করে আর এভাবেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ঝগড়া-বিবাদ হয়, তারপর স্বার্থান্বেষি মহল তাদের খোঁজে থাকে। সমাজের বিরুদ্ধে এদের মস্তিষ্কে বিষ ঢুকিয়ে দেয়। এরূপ বঞ্চিত শ্রেণী যাদের অধিকার খর্ব করা হয়, অবশেষে এরা নিজের অধিকার আদায়ের জন্য যা কিছু করে তাকেই বৈধ মনে করে। তারা যা ইচ্ছা করে আর মনে করে ঠিক করছে। তারা মনে করে, তাদের এই সহানূভুতিশীলরাই তাদের হিতাকাঙ্খী, মূলতঃ সমাজে বিশৃঙ্খলা ছাড়ানোর জন্য এদেরকে ব্যবহার করে থাকে। যদি দরিদ্র দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন এমন এতীম! যাদের পরিবার বা আত্মীয়-স্বজন যাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়নি অথবা অবস্থা এমন নয় যে, দৃষ্টি রাখতে পারে কেননা নিজেরা দারিদ্রতার যাঁতাকলে পিষ্ট, এধরণের শিশুরা তরবিয়তের ঘাটতির অভাবে বরং একেবারেই অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হবার ফলে গঠণমূলক কাজ করতে পারে না। এরপরে তাদের খপ্পরে পরে যারা এদের দিয়ে অবৈধ কাজ করিয়ে থাকে।

এভাবে যাদের বড় পরিবার, যাদের সন্তান-সন্ততি অনেক, তারা তাদের সন্তানদের সঠিকভাবে লালন-পালন করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ, আমি পাকিস্তানে দেখেছি; এদেরকে বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেয়। মাদ্রাসায় অগনিত দরিদ্র শিশুরা রয়েছে। যদিও সেখানে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে কিন্তু একটি বড় সংখ্যা ধর্মের নামে ধর্মঘট, বিশৃঙ্খলা এবং অনেক সময়

আত্মঘাতি আক্রমনের জন্য প্রস্তুত থাকে। জিহাদের নামে, জিহাদের অপব্যাখ্যা করে তাদের ব্রেইন ওয়াশ করা হয়। যদি এধরণের এতীম এবং দরিদ্র মানুষকে সামলানো যেত, তাদের আর্থিক অসচ্ছলতা না থাকতো, লেখাপড়ার সুযোগ পেত তাহলে ব্যাপক সংখ্যক এ ধরণের ফিৎনা-ফাসাদ থেকে বাঁচতে পারতো।

একবার আমি ভেরা অঞ্চলে গিয়েছিলাম। ভেরা পার হয়ে আমরা শিকারের উদ্দেশ্যে গ্রামের দিকে গিয়েছিলাম সেখানে কিছু ছেলের সাথে দেখা হয় আর তারা মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। তাদের সাথে কথা-বার্তা আরম্ভ হয়। আমি জিজ্ঞেস করি কি কি পড়? আর কি কি কর? তারা পড়ালেখার কথা কমই বলেছে, বলেছে আমরা এখানে হ্যান্ড গ্রেনেডও বানিয়ে থাকি। আমরা এখানে নিজেদের কার্তুজও তৈরী করি বরং আমাদেরকে বন্দুক বানানোর ট্রেনিং দেয়া হয়ে থাকে। এই হলো অবস্থা। মাতা-পিতা তাদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন আর সেখানে এই দরিদ্র বাচ্চাদেরকে যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় তা এমনই যে, পরবর্তীতে এদেরকে জিহাদের নামে অন্যায়ভাবে উগ্রপন্থী কাজ-কর্মে ব্যবহার করা হয়। বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। পিতা-মাতা এই আশা নিয়ে বসে থাকে যে, কমপক্ষে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ হবে, আমাদের সন্তান বেঁচে যাবে কিন্তু এটি জানে না যে, তারা কাদের খপ্পরে পড়েছে যারা নিজেদের স্বার্থে সেই বাচ্চাদের দিয়ে ধর্মের নামে হত্যা করাতেও দ্বিধাবোধ করে না।

সুতরাং এই বিশৃঙ্খলা থেকে বেঁচে থাকার জন্য, এটি সমাজের দায়িত্ব এবং সমকালিন সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে এই শ্রেণীর দেখা-শোনা করা। তাদের তিরষ্কারের পরিবর্তে বুকে টেনে নিন। তাদের আবেগে আঘাত দেয়ার পরিবর্তে আরো বেশি তাদের আবেগ-অনূভুতির প্রতি দৃষ্টি দিন। কেননা এই দূর্বল শ্রেণী খুবই সূক্ষ আবেগ সম্পন্ন। সমাজের উচিৎ তাদের আবেগকে গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা আর এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের প্রতি একান্ত অনুগ্রহ সূলভ আচরণ না করা হয়। আর একাজ যেখানে সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীকে সম্মান প্রদান করবে সেখানে সমাজের শান্তি এবং নিরাপত্তারও নিশ্চয়তা প্রদান করবে। এরপরে এতীমদের দেখাশোনা এবং মিসকিনদের প্রতি খেয়াল যারা রাখে তারা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়ভাজনও হয়ে থাকে।

মহানবী (সা.) বলেন, আমি এবং যারা এতীমের দেখাশুনা করবে তারা জান্নাতে এভাবে থাকবো যেভাবে দু'টো আঙ্গুল পাশাপাশি থাকে (নিজের দু'টো আঙ্গুল তুলে মিলিয়ে দেখিয়েছেন যে এভাবে) অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি আমার নৈকট্য লাভ করবে। (ইবনে মাজা, আব্ওয়াবুল আদাব, বাব হাক্কুল ইয়াতীম)

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, তিনি (সা.) বলেছেন, মুসলমানদের গৃহের মধ্য থেকে উত্তম গৃহ সে'টি যেখানে এতীমের লালন-পালন হয়ে থাকে। (ইবনে মাজা আব্ওয়াবুল আদাব, বাব হাক্কুল ইয়াতীম)

আরেক বর্ণনায় এসেছে, তিনি (সা.) বলেছেন, মানুষের দূর্ভাগা হবার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে তাচ্ছিল্লের দৃষ্টিতে দেখে। দরিদ্র এবং মিসকীনদেরকে যারা তাচ্ছিল্লের দৃষ্টিতে দেখে এটি তাদের জন্য যথেষ্ট চিন্তার ব্যাপার। (মুসলিম, কিতাবুল্ বিরর ওয়াস্সিলাতে, বাবু তাহরিমী যুলমিল মুসলিমে ওয়া খাযলেহী)

প্রসঙ্গক্রমে আমি এখানে এটিও বলে দিতে চাই যে, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এতীমদের দেখাশোনার জন্য জামাতে ব্যবস্থা আছে। পাকিস্তানেও একটি কমিটি বানানো হয়েছে যারা রীতিমত খোঁজ-খবর নিয়ে তাদের শিক্ষা, তাদের জীবন-যাপনের পুরোপুরি খেয়াল রাখে আর এভাবে অন্যান্য দেশেও, বিশেষভাবে আফ্রিকার দেশগুলোতেও আল্লাহ্‌র ফযলে তাদের প্রয়োজন পুরো করার চেষ্টা করা হয়। এতীমদের দেখাশোনার জন্য একটি ফান্ড আছে এতেও জামা'তের সদস্যদের প্রাণ খুলে দান করা উচিত যাতে বেশি বেশি এতীমদের প্রয়োজন পূর্ণ করা সম্ভব হয়।

অনুরূপভাবে দরিদ্র মেয়েদের বিবাহের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে যে 'মরিয়ম শাদী ফান্ড' এর তাহরীক করেছিলেন, সূচনাতে এর প্রতি অনেক মনযোগ ছিল আর জামা'ত পুরোপুরি অংশ নিয়েছে, মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। এখনও আল্লাহ্‌র কৃপায় কোন বাঁধা নেই কিন্তু যত বেশি আর যে উৎসাহ নিয়ে জামা'তের সদস্যরা এতে

"প্রতিবেশিদের সাথে সদ্ব্যবহার যেখানে শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করবে সেখানে এর ফলে তবলীগেরও উত্তম পথ উম্মুক্ত হবে।"

অংশ গ্রহণ করছিল আর চাঁদা দিচ্ছিল, টাকা-পয়সা আসছিল এখন সেভাবে আসছে না। তাই এদিকেও জামা'তের সদস্যদের বিশেষভাবে নিষ্ঠাবান বন্ধুদের মনযোগ দেয়া উচিত। এই যে এতীম, দরিদ্র এবং মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার এটি নিশ্চয় সদ্ব্যবহারকারীদের জন্য জান্নাতের শুভসংবাদ প্রদান করে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) সেই শান্তির আবাসের শুভসংবাদ প্রদান করে যে, তারা কয়েক জনের মঙ্গল ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য চেষ্টা করেছে, তাদের দু:খ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করেছে।

একটি বর্ণনায় এসেছে মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে স্বীয় নিরাপত্তা এবং দয়া আবৃত রাখবেন আর তাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করবেন যে দূর্বলদের প্রতি রহম করে, মাতা-পিতাকে ভালোবাসে এবং খাদেম ও চাকরদের সাথে ভালো ব্যবহার করে। (তিরমিযি, সিফাতুল কিয়ামাতি)

এরপরে সমাজে শান্তি, ঐক্য এবং ভালোবাসার পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে বলেছেন, প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার কর। কেবল আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহারই নয়, এক্ষেত্রে শতভাগ নি:স্বার্থ আর কেবলমাত্র খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য সদ্ব্যবহার দেখা যায় না বরং অনাত্মীয়দের সাথেও করতে হবে। অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে পছন্দ অপছন্দের বিষয় উঠে। আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা যে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করে তখনই বুঝা যাবে যখন অপরের সাথেও সদ্ব্যবহার করবে। অনাত্মীয় প্রতিবেশী যারা আছে তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার কর।

প্রতিবেশির অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে যত্নবান হবার জন্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এত বেশি নির্দেশ রয়েছে, ধারাবাহিকভাবে এ ব্যাপারে মহানবী (সা.)-এর মনযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তিনি (সা.) বলেছেন, আমার মনে হলো সম্ভবত এখন প্রতিবেশিরা আমাদের উত্তরাধিকারে অংশীদার হয়ে যাবে। প্রতিবেশিদের এই যে গুরুত্ব তা আমাদের মাঝে এ চেতনা সৃষ্টি করার জন্য যে, তাদের প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের প্রয়োজনাদী পূর্ণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এরাও প্রতিবেশী যারা ঘরের চার দেয়ালের বাইরে নিকটতম মানুষ। যদি এরা পরস্পরের সাথে সদ্ব্যবহার না করে, একে অপরের জন্য কষ্টের কারণ হয়। তাহলে যে গলিতে এই ঘর যেখানে সদ্ব্যবহার করা হয় না তাহলে সেই গলিই বিশৃঙ্খলার আখড়ায় পরিণত হবে। সে গলিতে শান্তির সুবাতাস বইতে পারে না। ঘর থেকে বেরোলেই সবচেয়ে বেশি দেখা সাক্ষাত হয় প্রতিবেশির সাথে। যদি তাদের হৃদয়ের গভীর থেকে শান্তির বার্তা পৌঁছান তাহলে সেও আপনার জন্য শান্তির কারণ হবে।

এই পাশ্চাত্যে প্রত্যেকে নিজেকে নিয়ে মগ্ন, তাদের জীবন-যাত্রা এমনই যে, নিজেদের ঘর বা একেবারে আপনজনের। ইসলাম আমাদেরকে প্রতিবেশির ব্যাপারে যে শিক্ষা দিয়েছে সে চিত্র এখানে একেবারেই নেই। এটিই ইসলামের অনুপম বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক ছোট-খাট বিষয়ের প্রতিও আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করেছে আর এর ফলে বড় বড় জান্নাতের সংবাদ প্রদান করেছে যেন সবদিক থেকে সমাজে শান্তি বিস্তার করার জন্য প্রত্যেক মু'মিন চেষ্টা করে। যখন এদের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছাতে গিয়ে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখবেন, যখন তারা এটি জানবে যে, এরা নিঃস্বার্থভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখছে, আমাদের প্রতি সহানুভূতির কারণে সম্পর্ক গড়ছে, তখন এরা আনন্দিতও হয় আর আশ্চর্যও হয় কেননা, এতে তারা অভ্যস্ত নয়।

এসব বিষয়, তাদের কথা-বার্তা এবং ধ্যান-ধারণা থেকে সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। এই সম্পর্ক বৃদ্ধির কারণে প্রকৃতিগত স্বভাবের যে আওয়াজ, যদি পবিত্র স্বভাবের হয় তাহলে প্রকৃতি সবার কাছ থেকে এটিই চায় যে, সদ্ব্যবহার করা হোক। প্রকৃতির সেই আওয়াজ তাদের মাঝেও ধ্বণিত হয়। তারাও এতে আনন্দিত হয় যে, আমাদের প্রতিবেশি আমাদের সাথে ভালো সম্পর্কের কারণে যোগাযোগ রাখে। কোন স্বার্থ বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নয়। ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ এতে আনন্দিত হন।

আমি যখন এসকল পশ্চিমা দেশে বসবাসকারীদেরকে বিশেষভাবে প্রতিবেশিদের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখার প্রতি মনযোগ আকর্ষণ করেছিলাম, বিভিন্ন স্থান থেকে আনন্দের রিপোর্ট পেয়েছি। যারা পাকিস্তান এবং এশিয়ার মুসলমান প্রতিবেশিদের পক্ষ থেকে ভীত-ত্রস্ত ছিল যখন তাদের সাথে সম্পর্কোন্নয়ন হতে আরম্ভ করে, ঈদ, কুরবানীর ঈদের সময়, তাদের উৎসবের সময় যখন তাদের পক্ষ থেকে উপহার পাঠানো আরম্ভ হয় তখন এর ফলে তাদের মাঝে নম্রতা সৃষ্টি হওয়া আরম্ভ হয়েছে। তাদের ভয়ও দূরীভূত হয়। তারাই যারা ইসলামকে উগ্র এবং শান্তি বিনষ্টকারী ধর্ম মনে করতো তারা ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে। মসজিদে ফযল হালকাও গত দু বছর থেকে প্রতিবেশিদের নিমন্ত্রণ করে ভোজ ইত্যাদির আয়োজন করছে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও মানুষ নিজেদের বাড়ীতে করে থাকবে। এবছরও তারা যে অনুষ্ঠান করেছে আমি তাতে যোগদান করেছি, যখন আমি প্রতিবেশিদের সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা তাদের সামনে বর্ণনা করেছি তখন সবাই বিস্ময় ও আনন্দের সাথে তা শ্রবণ করেছে এবং বাহ্যিকভাবে তা প্রকাশ করেছে, শুকরিয়া আদায় করেছে এবং এখন বিভিন্ন সময়ে সে সকল প্রতিবেশির কাছ থেকে আমি চিঠি-পত্র পাই, বিভিন্ন কার্ডও এসে থাকে। তাই প্রতিবেশিদের সাথে সদ্ব্যবহার যেখানে শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে সেখানে এর ফলে তবলীগের উত্তম পথ উম্মুক্ত হয়।

যদি ধর্মের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ নাও থাকে তাহলে কমপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের মস্তিষ্কে যে বিষ ঢুকানো হয়েছে তা বেরিয়ে যাবে। যদি প্রতিবেশির সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় থাকে তাহলে সমগ্র বিশ্বে শান্তি এবং সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। পৃথিবী থেকে বিশৃঙ্খলা দূর হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, প্রতিবেশির সীমানা ১০০ ক্রোশ দুরত্ব পর্যন্তও বিস্তৃত হয়ে থাকে। আহমদীরা বিশ্বের ১৮৫টির বেশি দেশে বসবাস করছেন। অনেক এলাকায় হতে পারে অল্প আছে অথবা বেশি। নিজেদের আশে পাশের শ' শ' মাইল এলাকাকেও নিজেদের শান্তির বার্তা দ্বারা সুরভিত করুন তাহলে বিশ্বের এক বিস্তৃত অঞ্চলে ইসলাম সম্পর্কে যে ভুল বোঝা-বুঝি রয়েছে, এর বিরুদ্ধে যে উগ্রতা এবং যুলুম নির্যাতনের অপবাদ

আরোপ করা হয় সেসব দাগ মুছে যেতে পারে। যদি আমরা এরূপ না করি তাহলে আমরা যুগ ইমামের সাথে কৃত সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করবো।

পুনরায় আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক যার মাধ্যমে তোমাদের সত্যিকার মুসলমান হওয়া সম্পর্কে জানা যায়, আরো বিস্তৃত হওয়া উচিত, আরো ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। কেননা তোমাদের সম্পর্ক যত বিস্তৃত হবে বা বাড়তে থাকবে শান্তিপূর্ণ এবং নিরাপত্তা বিস্তারকারী সমাজ তত প্রশস্ত হতে থাকবে। কত বেশি ব্যাপকতা দিতে হবে? পুরো সমাজকে তার আওতায় নিয়ে নিয়েছে। প্রথমতঃ প্রতিবেশিদেরকে এর আওতায় নিয়েছে। তারপর বলেছে, তোমাদের সঙ্গী-সাথী যারা সভা-সমিতিতে তোমাদের সাথে আছে যারা তোমাদের সাথে কাজ করে, অফিস-আদালতে তোমাদের সাথে থাকে, ব্যবসা ক্ষেত্রে তোমাদের পাশে আছে, এদের সবার সাথে তোমাদের অনুগ্রহ সূলভ ব্যবহার প্রত্যাশা করা হয়। তারপর বিভিন্ন মিটিং'এ, বৈঠকাদীতে, সমাজে সহাবস্থান করে তাই এখানেও প্রেম-প্রীতি এবং দয়াসূলভ ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। এখন এত ব্যাপক সমাজ এবং সমাজের অধিকার প্রদানের নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে যদি মানুষ চিন্তা করে কেউ এ গন্ডির বাইরে নেই আর এ প্রশ্নেরও কোন অবকাশ থাকে না যে, কোন মানুষের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের কলুষতা হৃদয়ে থাকে। বরং উম্মুক্ত হৃদয়ে প্রত্যেককে মানুষ শান্তির উপহার প্রেরণ করবে। হৃদয়ে কোন প্রকারের কষ্ট-বেদনা থাকতেই পারে না।

অনেক সময় ইজতেমা এবং জলসায় বিভিন্ন প্রকার তিক্ততা সৃষ্টি হয় এবং জলসাও আসতে যাচ্ছে আর বিভিন্ন ইজতেমাও শুরু হতে যাচ্ছে। তাই যদি এরূপ চিন্তা-চেতনা হয় যে, আমার পক্ষ থেকে এখানে অনুগ্রহের প্রেরণা ব্যতীত আর কোন ধরণের ব্যবহার প্রকাশ পাওয়া উচিত নয় তাহলে এটিই সমাজে শান্তি বিস্তারের কারণ হবে আর সদ্ব্যবহারের ফলে মানুষ একে অপরের সাথে উত্তম সম্পর্ক সৃষ্টিকারী হবে।

এরপর সমাজের ওপর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'লার শান্তির বার্তা অন্যদের কাছে পৌঁছানো। যেভাবে পূর্বেও বলা হয়েছে যে, আপন-পর সবার মাঝে সালামের প্রচলন করো। যখন কোন মুসলমান কাউকে সালাম করে তখন মুসলমানের জন্য নির্দেশ হচ্ছে, তাকে পূর্বের চেয়ে আরো বেশি শান্তি ফিরিয়ে দাও। এরূপ শান্তি যখন একটি সমাজে,

একটি আহমদী সমাজে ফিরিয়ে দেয়ার প্রবর্তন হবে তখন সব ধরণের ঝগড়া-বিবাদ, ফিৎনা-ফাসাদ, মারামারি-কাটাকাটি এবং অসন্তোষের মূলোৎপাটন হবে আর তা শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহদ্বারা দাও এবং সালাম সম্পর্কেও এসেছে যখন সালাম করো তখন উত্তমভাবে তা ফিরিয়ে দাও। উপহার সম্পর্কেও এসেছে, যদি কেউ তোমাদেরকে উপহার দেয় তাহলে এর বিনিময় তোমরা উত্তমভাবে দাও অথবা কমপক্ষে সেরূপই তাদেরকে দাও।

একদা একটি বৈঠকে এক ব্যক্তি আসেন, তিনি মহানবী (সা.)-কে আস্‌সালামু আলাইকুম বলে বসে পড়েন। মহানবী (সা.) উত্তরে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ॥ এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্। তিনি (সা.) বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু। তৃতীয় ব্যক্তি এসে বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্ ওয়া বারাকাতুহু তিনি (সা.) বলেন, আলাইকুমুস্ সালাম অথবা সম্ভবত আলাইকুম। তখন কাছে বসে থাকা একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, বাকী দু'জনকেতো আপনি দোয়ার বাক্যদ্বারা সম্ভাষন করেছেন উত্তম প্রত্যুত্তর দিয়েছেন আর একে কেবল আলাইকুম বলেছেন। উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, তারা যতটুকু সালাম বলেছিল তাতে উত্তমভাবে ফিরিয়ে দেয়ার সুযোগ ছিল, তাই আমি তাদেরকে উত্তমভাবে সালাম করেছি। এই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম দোয়ার বাক্য বলেছে তাই এছাড়া আর কোন উত্তর ছিল না তাই আমি কমপক্ষে সেই নির্দেশের আলোকে যে, তাই ফিরিয়ে দাও সেহেতু আমি আলাইকুম বলে সেভাবেই তার সালামের উত্তর দিয়েছি। এই হলো শান্তি পৌঁছানোর পদ্ধতি আর মহানবী (সা.)-এর আদর্শ।

এরপর বলা হয়েছে, "ওয়াছছাহিবী বালযামবি" -এর অর্থ এটিও যে, সহকর্মী। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি। অধিনে যারা কাজ করে, অফিসাররা উর্দ্ধতন তাই তাদের

"এতীমদের দেখাশোনার জন্য প্রতিষ্ঠিত ফান্ড এবং দরিদ্র মেয়েদের বিবাহ-শাদীর জন্য প্রতিষ্ঠিত মরিয়ম শাদী ফান্ডে জামা'তের সদস্যদের মুক্ত হস্তে দান করা উচিত"

সবার জন্য শুভকামনা থাকা প্রয়োজন। এদের সবাইকে শান্তির বার্তা পৌঁছানো উচিত।

এরপর বলা হয়েছে মুসাফিরদের সাথেও এরূপ ব্যবহার কর। সফরে যারা অল্প কিছু সময়ের জন্য সাথী হন, সেখানেও তোমাদের মধ্যে সদ্ব্যবহারের দৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়া চাই, যেন এই সামান্য সময়ের সম্পর্কেও কোন মন্দ প্রভাব না ফেলে। এই হচ্ছে বান্দার কাছ থেকে খোদা তা'লার প্রত্যাশা, সমাজে বিশৃঙ্খলা বা বিবাদ সৃষ্টি করার মত সামান্য কোন সুযোগও যেন সৃষ্টি না হয়।

এরপর বলেছেন, তাদের সাথেও সদ্ব্যবহার করো যারা তোমাদের অধীনস্ত বা যাদের ওপর তোমাদের কর্তৃত্ব রয়েছে, তোমাদের অধীনে কাজ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের আওতাভূক্ত সে সব প্রাণীর সাথেও সদয় ব্যবহার করো। এই হচ্ছে দূর্বল শ্রেণী এবং অধীনস্তদের সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী নির্দেশ। যাদেরকে তোমরা নিজেদের গোলাম বা দাস মনে করো যারা তোমাদের অধীন তাদের প্রতি কঠোরতা এবং অত্যাচার কর না। নির্দেশ হচ্ছে, তাদের দ্বারাও এমন কাজ করাবে না যা তাদের সাধ্যাতীত। যদি এমন কোন কঠিন কাজ হয় তাহলে তাদেরকে সাহায্য কর, এটি সেই নীতি যার ফলে সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি বিস্তারকারী হতে পারে। এটিই নীতি এবং সর্বদা যেন মাথায় থাকে যে, আমাকে অনুগ্রহ করতে হবে যার মাধ্যমে ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি জন্ম নেয়। যার ফলে অধীনস্তরাও মালিকের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে। নতুবা অধীনস্তদের কাছ থেকেও যদি তাদের সাধ্যাতীত কাজ করানো হয় তাহলে এটি তাদের হৃদয়ে ঘৃণার বীজ বপন করে যা পরিশেষে শান্তির পরিবর্তে বিশৃঙ্খলায় রূপ নেয়।

এ আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ইন্নাল্লাহা লা ইউহিব্বু মান কানা মুখতালান ফাখুরা" আল্লাহ্ তা'লা দাম্ভিক এবং অহংকারীকে আদৌ পছন্দ করেন না। যেভাবে আমি বলেছিলাম, এই সর্বশেষ নির্দেশ দিয়ে অথবা তাঁর অপছন্দের প্রকাশ করতঃ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে এ বিষয়ের ওপর আমল করে না সে অহংকারী। সে আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার বান্দা হতে পারে না আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক প্রেরীত নবীদেরকে গ্রহণ করে না। নবীদের ইতিহাস থেকেও আমরা একথাই জানতে পারি। বরং অহংকারের ফলে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেননা শয়তানও অহংকারের কারণেই অস্বীকার করেছিল।

বর্তমান যুগেও দেখুন! তাদের অহংকারই তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানতে বাঁধা দিচ্ছে অথবা সে পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে, আর এই অহংকারই আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যে সম্পর্কে খোদা তা'লা তাঁর অপছন্দের কথা বর্ণনা করেছেন। তাই এরা লক্ষবার শান্তির দাবী আর এলক্ষ্যে চেষ্টা করলেও সফল হতে পারবে না। কেননা তারা অহংকারের কারণে আল্লাহ্ তা'লা কতৃক প্রেরীত ইমামকে অস্বীকার করেছে ফলে সেই শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে যা কেবল আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকেই আসে। শান্তিতো আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে। যদি আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় ভাজনদের সাথে অহংকারমূলক ব্যবহার করো, তাদেরকে অস্বীকার করো তাহলে শান্তি থেকেও বঞ্চিত হবে। সুতরাং আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই ইমামকে চেনার তৌফিক দিয়েছেন। তাই আমাদেরকে সেসব বিষয়ের ওপর অভিনিবেশ করে সত্যিকার দাস আর সঠিকভাবে সৎকর্ম সম্পাদনের চেষ্টাকারী হওয়া উচিত। নতুবা এমন যেন না হয় যে, আমাদের মাঝ থেকে কেউ আল্লাহ্ তা'লার অপছন্দের স্বীকার হয়ে সে সব নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে যা আল্লাহ্ তা'লা একজন মু'মিনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সে সব শুভসংবাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় যা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে দান করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার কাছে সমর্পিত হয়ে, তাঁর সাহায্য কামনা করতঃ আমাদের নিজেদের আত্মিক বিশ্লেষণ করা উচিত যে, যদি অতীতে কোন ঘাটতি আর অলসতা হয়েও থাকে তাহলে খোদা তা'লার রহমত যাচনা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা বড়ই দয়ালু। আল্লাহ্ বলেন, যদি ভুল বশতঃ তোমরা কোন কাজ করে ফেল তাহলে আমি ক্ষমাকারী। আল্লাহ্ তা'লার রহমত কামনা করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লার শান্তির বার্তা আমরা লাভ করি আর আমরা তাঁর ক্ষমার চাঁদরে আবৃত হই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'মু'মিন সুন্দর হয়ে থাকে। যেভাবে একজন সুন্দর মানুষকে সাধারণ এবং সামান্য গহনা পড়ানো হয় তাহলে তা তাকে আরো সুন্দর করে তুলে আর যদি সে কুকর্মশীল হয় তাহলে তা মূল্যহীন। মানুষের অভ্যন্তরে যখন সত্যিকার ঈমান জন্ম লাভ করে তখন সে কর্মে একটি বিশেষ স্বাদ পায় এবং তার তত্বজ্ঞানের চোখ উন্মুক্ত হয়। সে সেভাবে নামায পড়ে যেভাবে নামায পড়া উচিত। পাপের প্রতি তার অনাসক্তি সৃষ্টি হয়। নোংরা বৈঠকের প্রতি ঘৃণা হয় এবং আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রতাপের বিকাশের জন্য তার হৃদয়ে একটি বিশেষ উদ্দিপনা আর আবেগ সৃষ্টি হয়। এধরণের ঈমান যা তাকে হযরত মসীহ্ (আ.)-এর ন্যায় ক্রুশ বিদ্ধ হবার ক্ষেত্রেও বাঁধা দেয় না। সে খোদা তা'লার জন্য আর কেবলই খোদা তা'লার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত আগুনে ঝাঁপ দিতেও পিছপা হয়না। যখন তার সন্তুষ্টিকে ঐশী সন্তোষের অধীন করে তখন আল্লাহ্ তা'লা যিনি 'আলিমুন বিযাতিস্ সুদুর' (অন্তর সমূহে যা আছে সে সম্পর্কে তিনি সবিশেষ অবহিত) তিনি তার নিরাপত্তা ও রক্ষক হয়ে যান এবং তাকে ক্রুশ থেকেও জীবন্ত উদ্ধার করেন আর আগুন থেকেও নিরাপদে বের করে আনেন। কিন্তু এই আশ্চর্য ঘটণাবলী তারাই দেখে থাকেন যারা আল্লাহ্ তা'লার ওপর পরিপূর্ণ ইমান রাখেন।' (রাবওয়া থেকে প্রকাশিত মলফুযাত, নব সংস্করণ-১ম খন্ড, ২৪৯পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবার ঈমান পরিপূর্ণ করুন এবং সর্বদা আমাদের ওপর তাঁর সুদৃষ্টি রেখে আমাদেরকে সব ধরণের আগুন থেকে নিরাপদে উদ্ধার করুন এবং আমরা সর্বদা তাঁর রহমত, ক্ষমা এবং কৃপার দৃশ্য দেখতে থাকি।

[হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত মূল খুতবা থেকে বাংলা ডেস্ক, লন্ডন কর্তৃক অনুদিত]

কলমের জিহাদ

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর–২১)

৩–আততায়ীর হাতে আমীর হাবিবুল্লাহ খানের মৃত্যু

১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী'র মধ্য ভাগে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমীর হাবীবুল্লাহ্ খানের সাথে সর্দার নসরুল্লাহ্ খান জালালাবাদের পূর্বাঞ্চল সিরোতে শিকারে গমন করেন। সেখানে ২০শে ফেব্রুয়ারী রাতের আঁধারে অজ্ঞাত–নামা এক আততায়ীর হাতে আমীর হাবীবুল্লাহ্ খান নিহত হন। এভাবে একটার পর একটা ঐশী–শাস্তির ঘটনা মহাকালের বুকে মহা–সাক্ষী হয়ে থাকলো।

৪–সর্দার নাসরুল্লাহ্ খানের কারাদণ্ড ও মৃত্যু

১৯১৯ সালে ১৩ই এপ্রিল সর্দার নসরুল্লাহ্ খান তার ভাতিজা আমানুল্লাহ্ খান (আমীর হাবিবুল্লাহ খানের পুত্র এবং পরবর্তী আমীর) কর্তৃক আজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হন। বন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ সম্বন্ধে স্যার পারসী সাইকস তাঁর পুস্তক "আফগানিস্তানের ইতিহাস" (History of Afghanistan) ২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখেন: "১৩ এপ্রিল সাবেক আমীরকে খুন করার জন্য প্ররোচিত করায় এক গণদরবারে নসরুল্লাহ্ খান অপরাধী ঘোষিত হয় এবং তাকে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে অল্পকালের মধ্যেই নসরুল্লাহ্ খান শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তার মৃত্যু সংবাদ ক'মাস পর্যন্ত প্রচারিতই হয় নি।" এই নসরুল্লাহ খানের নির্দেশেই হযরত আব্দুল লতীফ সাহেবকে খুশত থেকে গ্রেফতার করে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় কাবুল আনা হয়েছিল এবং কারাগারে ক্ষুদ্র ও নির্জ্জন কক্ষে বন্দী রাখা হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লাও একইভাবে নসরুল্লাহ খানকে লাঞ্ছিত করে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন।

৫– রাজ–পরিবারের ছিন্ন–ভিন্ন অবস্থা

আমীর হাবিবুল্লাহ খানের দ্বিতীয় পুত্র হায়াতুল্লাহ খানকে বাচ্চা সাক্কা হত্যা করে। দেশে আমানুল্লাহ খানের অনুপস্থিতিতে সে সিংহাসন দখল করেছিল। তাকে গোপনে রাজপ্রাসাদের দেওয়ালের নীচে কবর দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লার ক্রোধে নিপতিত হয়ে এভাবে কাবুলের রাজ–পরিবার ছিন্ন–ভিন্ন হয়ে যায়।

৬–মোল্লাদের পক্ষ অবলম্বনকারী বিচারকের শোচনীয় পরিণতি

তৃতীয় অপরাধী ছিল ডঃ আব্দুল গণি। তার বাড়ী ছিল তদানিন্তন বৃটিশ ভারতের গুজরাট জেলায়। তিনি তার অপর দুই ভাইসহ ভাগ্যের অন্বেষণে কাবুল আগমন করেন। ধীরে ধীরে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাবুলের আমীর বিভিন্ন ব্যাপারে তার মতামত গ্রহণ করতেন। সাহেবযাদা হযরত আবদুল লতীফ এবং মোল্লাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রহসনমূলক বিতর্কে তাকে বিচারক নিযুক্ত করা হয়। হযরত আব্দুল লতিফ সাহেব মোল্লাদের উত্থাপিত প্রশ্ন গুলোর এমন দাঁত–ভাঙ্গা জবাব প্রদান করেন যা পাল্টা যুক্তি–প্রমাণ দ্বারা খন্ডন করতে ব্যর্থ হয়ে জন–সম্মুখে আলোচনার বিষয়–বস্তু প্রকাশের সৎসাহস দেখতে পারে নাই তৎকালীন মোল্লা নেতৃত্ব। বিতর্কের বিষয় ছিলঃ প্রতিশ্রুত মসীহর দাবী, জিহাদের তাৎপর্য এবং যীশু–খৃষ্টের মৃত্যু।

ড. আব্দুল গণি প্রকাশ্যভাবে মোল্লাদের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং হযরত আব্দুল লতীফের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য বিবেচনা না করে এক–তরফাভাবে মোল্লাদের পক্ষে রায় প্রদান করেন। এই ঘটনার পর তাঁর ওপর ধীরে ধীরে আল্লাহতাআলার গযব নেমে আসে। পরবর্তীতে আমীরের সঙ্গে মত–বিরোধীতার কারণে তার ভাইসহ তাকে এগার বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে দেশে (ভারতে) ফেরার সময় রাস্তায় তার স্ত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়। পথিমধ্যে তার যুবক পুত্র আব্দুল জব্বারকে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি হত্যা করে। কারাভোগের পর ড. আব্দুল গণিকে ভারতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে নিজ গ্রামে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চরম দুর্দশার মধ্যে কাটিয়ে তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করে। তার চতুর্থ শাস্তি ছিল, তার দ্বিতীয় পুত্র একজন টাঙ্গা চালক ছিল। সে একটি ঘোড়ার গাড়ী চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করত। এভাবে, আল্লাহ্ তা'লা তাকে এবং তার সমগ্র পরিবারকে উন্নতির চরম শিখর থেকে অবনতির অতল গহ্বরে ফেলে দেন।

৭– আফগানিস্তানে ক্রমবর্ধমান জঙ্গীবাদী ধ্বংসাত্মক এবং সহিংস কর্মকান্ডের অব্যাহত ধারার শেষ কোথায়?

দু'জন নিরীহ এবং স্বনাম–ধন্য বিশিষ্ট আহমদী–মুসলমানকে ইসলামের পবিত্র কলেমার অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও নির্মমভাবে হত্যা করার পর থেকে বিগত একশত বছরের

অধিক কাল ঐ দেশে এক দিনের জন্য রক্তপাত-মূলক ঘটনা বন্ধ হয় নাই। সে দেশের ইতিহাস এ কথার জলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে। সামনে আর কতকাল এই ভয়াবহ ধ্বংসলীলা চলতে থাকবে এবং কাবুল তথা আফগানিস্তানের জমিকে আরও কত মাশুল দিতে হবে তারই ইঙ্গিত রয়েছে পূর্বোল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীটিতে। প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানকারীগণ এই সকল ঘটনার কার্য-কারণ সম্পর্কের রহস্য উদঘাটন করতঃ দিনকে দিন এবং রাত কে রাত বলার মতো নৈতিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারবেন কি?

(গ) জঙ্গীবাদের উত্থান ও সম্প্রসারণের ভয়াবহতা

ইসলাম ধর্মের নাম ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং জোর-জবরদস্তী তথা অস্ত্রের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও বাস্তবায়নের জন্য জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া দুই-চারটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সমগ্র পৃথিবী বিশেষতঃ মধ্য-প্রাচ্য, দূর-প্রাচ্য এবং আফ্রিকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের উগ্রপন্থী মতাদর্শ-ভিত্তিক আন্দোলন বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে সমাজের সকল ক্ষেত্রে শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করছে। এই সকল সংগঠন ও জঙ্গীগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলোঃ যেভাবেই হোক রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করতে হবে এবং ইসলামের নাম ব্যবহার করে সেই ক্ষমতা লিপ্সাকে বৈধতা প্রদানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে।

এই ধরনের মতাদর্শকে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী অগনিত জঙ্গী-বাহিনী রয়েছে এবং নতুন নতুন বাহিনী তৈরি হচ্ছে। সেগুলোর পশ্চাতে সাহায্য-সমর্থন দানকারী অর্থাৎ অর্থায়ন এবং ব্যাপকহারে প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া সারা পৃথিবীতে সক্রিয় রয়েছে। ধর্মের নাম ব্যবহার করার কারণে অসতর্ক সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করার প্রক্রিয়া সহজতর হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে দরিদ্র দেশ সমূহের অবহেলিত এবং অনগ্রসর বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কিশোর ও যুবক শ্রেণীকে জঙ্গীবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতার নিশ্চয়তা এবং পারলৌকিক ক্ষেত্রে বেহেশত লাভের প্রলোভনও দেখানো হয়। ফলতঃ আত্মঘাতী বোমাবাজী এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণকারীগণ জীবন বিসর্জনেও দ্বিধা বোধ করে না। এক কথায় ধর্মকে ঢাল হিসেবে অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে যেভাবে পৃথিবী ব্যাপী চেষ্টা-প্রচেষ্টা তথা ষড়যন্ত্র এবং জঙ্গীবাদী তৎপরতা বেড়েই চলেছে তা থেকে উদ্ধারের জন্য এই মুহূর্তে ব্যক্তি, জাতি এবং পৃথিবী ব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং সুসমন্বিত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এজন্য আন্তঃধর্মীয় এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমঝোতা এবং পরমত-সহিষ্ণুতামূলক ইসলামী শিক্ষাকে অনুসরণ করতে হবে (এ সম্পর্কে কতকগুলো সুনিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণের দৃষ্টান্ত পরে উল্লেখ করা হবে)। সচেতন সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে সুদৃঢ় এবং বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু নীতিগত বা মৌখিকভাবে নয়, বাস্তবে দেশের সঠিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের স্বার্থে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সকল প্রকার অন্তর্ঘাতমূলক রাষ্ট্র বিরোধী এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড থেকে দেশের নিরীহ জনসাধারণ এবং তাদের জান-মালের নিরাপত্তা দিতে হবে।

বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সকল স্তরে জঙ্গীবাদের প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি প্রদর্শনকারী লুকিয়ে থাকা সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সনাক্ত করতে হবে যাতে তাদের সকল প্রকার কারসাজি ব্যর্থ হয়ে যায়। সেই সঙ্গে জঙ্গীবাদের সঙ্গে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তি, সংগঠন এবং গোষ্ঠীর অর্থায়ন প্রক্রিয়া, জন-শক্তি এবং কর্মী-বাহিনী ও অস্ত্র-সরবরাহ এবং অন্যান্য রসদ সামগ্রী এবং উস্কানীমূলক কর্মকান্ড খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও সম্মান, স্বাধীনতা এবং সভ্যতার খাতিরে। অস্তিত্বের প্রশ্নে কোন আপোষ হতে পারে না। সত্যের জন্য আপোষ করার অর্থই হলো আত্মবিধ্বংসী পথে নিরব শব যাত্রা। সেই প্রবাদটির কথা মনে রাখতে হবেঃ 'সর্ষের মধ্যে ভূত'। আর একটি চমৎকার প্রবাদ হলো "Eternal vizilance is the price of liberty" (সদা-সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রেখে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রতি মূহূর্তে সর্ব প্রকার ত্যাগ-স্বীকারমূলক মূল্য দিয়ে স্বাধীনতাকে সংরক্ষণ করতে হবে-এটাই হলো কথাটির ভাবার্থ)।

শান্তিপূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টার বাস্তব দৃষ্টান্ত

ইসলামের সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত নীতিদর্শন হলো : ধর্মের ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ (২:২৫৭ ও অন্যান্য আয়াত-পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। এখন প্রশ্ন হলোঃ বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে সময়োপযোগী পদক্ষেপ বিশিষ্ট এবং ঐশী প্রতিশ্রুত এবং ঐশী সাহায্যপুষ্ট সঠিক পথ ও পন্থা অবলম্বনকারী কোন সংগঠনের অস্তিত্ব কোথায়? এ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হলো এই যে, প্রথমত : পবিত্র কুরআন ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (একই প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের দু'টি বিশেষ উপাধী) প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিগত শতাধিক বছর যাবৎ বিশ্বে সকল মানুষের হৃদয় জয় করার চেষ্টা চালাচ্ছে ইসলামের আদর্শগত শিক্ষা ও সৌন্দর্য শক্তির মাধ্যমে (অস্ত্রের দ্বারা নয়)।

দ্বিতীয়ত : আমাদের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস জনীত কর্মপন্থা হলো এই যে, সত্যের মাধ্যমেই সত্যের বিজয়ের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতে হবে (মিথ্যা এবং কপটতার দ্বারা নয়)।

তৃতীয়ত : ঐশী প্রতিশ্রুত পথ ও পন্থায় আখেরী যুগে (সূরা জুমুয়াঃ ৪, সুরা নূরঃ ৫৬ এবং অন্যান্য বরাত সমূহ পূর্বে আলোচিত হয়েছে) ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নের জন্য আহমদীগণ সর্বশক্তি নিয়োগ করে শান্তিপূর্ণভাবে খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে ইসলামের তালীম-তরবীয়াত এবং প্রচার কাজ করছে (জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে নয়)।

চতুর্থত : মানব-জীবনের সকল স্তরে মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার এক মহা-প্রাচীর তৈরী করতে হবে, প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রতি অনুগত্য-পূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে সুবিচার ও ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে (ফতোয়াবাজী এবং উগ্রবাদীদের খেয়াল-খূশী এবং মর্জি মোতাবেক নয়)।

পঞ্চমত : ইসলামের মানবতাবাদী সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে বিশ্বব্যাপী আহমদী মুসলিম সম্প্রদায় এমন একটি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিপ্লবের বাণী প্রচার করে চলেছে যা "সকলের জন্য ভালোবাসা এবং কারো জন্য ঘৃনা নয়" (Love For All Hatred For None) -এই নীতি অবলম্বন এবং বাস্তবায়নের জন্য সু-পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ঐশী সাহায্যে দুই শতাধিক দেশে তারা অগনিত শান্তি-বিস্তারকারী প্রকল্প পরিচালনা করছে খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে এবং সাফল্যের

পথে প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে (কেচ্ছা-কাহিনী এবং মুখের ফুৎকার দ্বারা বিশ্ব-বিজয়ের স্বপ্ন বিলাসের মাধ্যমে নয়)। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব-জগৎ সমূহের মহাপ্রভূ এবং প্রতিপালক।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি পুর্ণ করবেন

উগ্রবাদী মোল্লাদের সৃষ্ট মহাসংকটময় পরিস্থিতি থেকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানসহ অন্যান্য মোল্লা-আক্রান্ত দেশগুলো এবং সেগুলোর জনসাধারনের জানমালের নিরাপত্তা এবং স্বাভাবিক জীবন যাপনের নিরাপত্তা কে দিতে পারে এবং কখন সেই অবস্থায় সৃষ্টি হবে? বলা নিস্প্রোয়োজন যে, কোন জাতীর নেতাদের ঘাড়ে মোল্লারা একবার চড়ে বসলে তাদেরকে ঘাড় থেকে নামানো খুবই কঠিন ব্যাপার। কথায় বলেঃ খালের পানিতে যে যতটুকু নামবে সে ততটুকু ভিজবে। তাই সমাগত যুগ-ইমামের নিম্নোক্ত সতর্কবাণী থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা ঐশী নির্দেশে ঘোষণা করেছেনঃ"পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করে নাই। অথচ আল্লাহ তাকে গ্রহণ করবেন এবং তাঁর সত্যতা প্রচণ্ড আক্রমণ সমূহ দ্বারা প্রকাশিত করবেন।" (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া) □

তিনি বলেছেন : "এই মূর্খ মৌলভীর দল যদি দেখে-শুনে অন্ধ সাজে তাতে বলার কিছু নেই। সত্যের তাতে বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি হবে না। বরং সে সময় অতি নিকটে, যখন অনেক ফেরাউন প্রকৃতিবিশিষ্ট (অহংকার-মত্ত) ব্যক্তি এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি বিশেষ মনোনিবেশসহ অনুধাবন করার জন্য ঐশী শাস্তি হতে রক্ষা প্রাপ্ত হবে। খোদা তা'লা বলেছেন, "আমি আক্রমণের পর আক্রমণ করতে থাকব, যতখন পর্যন্ত না তোমার সত্যতা মানুষের অন্তরে প্রবিষ্ট করে দেই।" অতএব হে মৌলবীগণ! খোদার সাথে তোমাদের যদি যুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকে, তবে তা কর।" (তাজ্জাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)

তিনি বলেছেন : "আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় আস্ফালন রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহর নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঐদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে। এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুস্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মু'মিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' এবং আমিই খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।" (সিররুল খিলাফা পুস্তক, পৃষ্ঠা ৭৬)

তিনি ঘোষণা করেছেন : " খোদা তা'লা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমায় বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দিবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীদের জামা'তকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদেরকে সকল জাতির ওপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারীরা এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ত্ব-দর্শিতা লাভ করবে, তারা স্ব-স্ব সত্যবাদিতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সবার মুখ বন্ধ করে দেবে। সকল জাতি এই নির্ঝর হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সঙ্ঘ তথা আহমদীয়া জামা'ত ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বর্ধিত হবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে। বহু বাধা দেখা দিবে এবং পরীক্ষা আসবে। কিন্তু খোদা সেগুলিকে পথ হতে অপসারিত করে দিবেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন।" ('তাজ্জাল্লীয়াতে ইলাহিয়া' পুস্তক)।

[চলবে]

বিজ্ঞপ্তি

তালীম দফতর

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দফতর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানানো যাচ্ছে যে, হুযূর (আই.)-এর অনমোদনক্রমে এ বছরও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১৪ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় পুরস্কার প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। ৮ম শ্রেণী এবং তদুর্ধ্ব পরীক্ষার্থীরা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামা'তের আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী/মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার সন্তান যদি এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১৫ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আমাদের জন্য কষ্টকর।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালিম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

যুগ ইমামের সাথে মুলাকাত ও যুক্তরাজ্য ভ্রমণ

মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

মরকজের অনুমতি ছিল আমার লন্ডন যাওয়ার। কিন্তু ভিসা হচ্ছিল না। বারবার ভিসার আবেদন প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিল। অবশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নির্দেশে বিশেষ ব্যবস্থায় ভিসার চেষ্টা নেয়া হল এবং ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ভিসা পেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। পরিকল্পনা অনুসারে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং বুধবার সকাল ১০:১৫ মিনিটে হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে এমরেটস এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট যোগে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, পথিমধ্যে যাত্রা বিরতির জন্য দুবাই বিমান বন্দরে যখন অবতরণ করলাম তখন স্থানীয় সময় দুপুর প্রায় ১টা। যাত্রা বিরতি শেষে দুবাই থেকে আবার সেখানকার স্থানীয় সময় ৩:৪৫ মিনিটে যাত্রা করলাম এবং লন্ডন স্থানীয় সময় সন্ধ্যা প্রায় ৮:০০টায় হিথ্রো বিমান বন্দরে নামলাম।

আমাদের ভাই আব্দুল খালেক তালুকদার সাহেব এবং নূরুদ্দিন সাহেব আমাকে নিতে এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। মসজিদ ফযল, লন্ডনের নিকটে মরকজের খাস গেস্ট হাউজ ৫৩তে আমার থাকার ব্যবস্থা ছিল।

দুবাই এয়ারপোর্ট অত্যন্ত আধুনিক এবং সুব্যবস্থার দিকে থেকে পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য এয়ারপোর্ট, অনেক বড় এয়ারপোর্ট। ৪/৫তলার ভেতর ছোট গাড়ীও চলে, রেলগাড়ীও চলে। আমার পা না থাকায় হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। দুবাই এয়ারপোর্টের প্রত্যেকটি জিনিস খুব চমৎকার, খুব পরিচ্ছন্ন। কোন প্রকার ত্রুটি চোখে পরে না। লন্ডন হিথ্রো এয়ারপোর্ট অনেক পুরাতন একটি এয়ারপোর্ট, সবকিছুই সুশৃঙ্খল কিন্তু দুবাই এয়ারপোর্টের সাথে এর তুলনা করা যায় না।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) আমার থাকা খাওয়ার এবং চলাফেরার বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা আমাকে দেয়া হয়েছিল। আমি ২৪ সেপ্টেম্বর লন্ডন পৌঁছলাম। সে সময় হুযূর (আই.) নতুন দেশে নতুন মসজিদ উদ্বোধনের জন্য আয়ারল্যান্ডে ছিলেন। পরের দিন আহমদ তারেক মুবাশ্বের আমাকে ইসলামাবাদে নিয়ে গেলেন। সর্ব প্রথম হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এবং তাঁর সহধর্মিনী আসিফা বেগম সাহেবার কবরে দোয়া করলাম। তারপর অনেক বন্ধুবান্ধবের সাথে অনেক বছর পর দেখা সাক্ষাৎ হল। যেমন মোহতরম মোহাম্মদ চৌ. (চিনি) সাহেবের সাথে দেখা হল। তাঁর বয়স মনে হয় ৯০ বছরের বেশী। যে রাস্তা হাঁটতে আমার ৫ মিনিট লাগে চিনি সাহেব তা ১৫ মিনিটে হাঁটেন। কিন্তু নিয়মিত সময় মেনে অফিস করেন। মসজিদে গিয়ে নামায পড়েন। রাবওয়াতে আমাদের পাশাপাশি বাসা ছিল।

পরের দিন শুক্রবার ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ সুরম্য মসজিদ বায়তুল ফুতুহতে জুমুআ

ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ মসজিদ বায়তুল ফুতুহর সামনে লেখক

পড়তে গেলাম। পরের জুমুআগুলোও বায়তুল ফুতুহতে পড়েছি। এত বড় আর এত সুন্দর মসজিদ না দেখলে বোঝা যাবে না। নিচতলা লাজনার জন্য, দ্বিতীয়তলা পুরুষদের জন্য। তিনতলার কয়েকটি অংশ, দুটি অংশ যারা চেয়ারে বসতে পারেন তাদের জন্য। সবকিছু অতি উত্তম, চমৎকার আলোর ব্যাবস্থা, লিফট, ওযুখানা ইত্যাদি। বায়তুল ফুতুহর দক্ষিণ পাশে বিশাল কার পার্ক। মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমার প্যান্ডেল এখানেই হয়েছিল। মসজিদের উত্তর পার্শ্বে প্রবেশ দ্বার। এখানে একটি আলাদা দালানে আমীর সাহেব ইউ.কে-র অফিস, সর্বসাধারণের খাবারের জন্য ডাইনিং হল। প্রবেশের পর সামনে পুরাতন দালান সংস্কার করে অনেক কিছুর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারপর একটি দালান নির্মান করা হয়েছে। এসব দালানের মধ্যে অনেক ধরনের অফিস এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের অনেকগুলো বড় বড় হলঘর আছে। লাইব্রেরী আছে, এম.টি.এ-এর সমস্ত কর্মকাণ্ডের ব্যাবস্থা করা হয়েছে।

লন্ডন বা ইংল্যান্ডের প্রধান লক্ষনীয় বিষয় হলো শৃঙ্খলা। সমগ্র দেশের সবকিছু বিশেষভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ। কোন স্থান বা কোন কিছুই শৃঙ্খলার বাইরে নয়। লন্ডন অনেক পুরাতন শহর, ঘন বসতি। দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় পরিচ্ছন্নতা। সর্বত্র আপনি পরিচ্ছন্নতা দেখবেন। সেদেশের মানুষ সময় ও নিয়ম মেনে, আইন মেনে শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে অভ্যস্ত। সবকিছু নিয়মের মধ্যে সময় বেঁধে চলে। তারা নিয়ম ভাঙতে জানে না।

মসজিদ ফযল লন্ডনের সাথে মাহমুদ হলের তিনতলায় অতি সংকীর্ণ কয়েকটি কামরায় হুযূর (আই.)-এর বাসস্থান। যেখানে পূর্বে ইমাম মসজিদ লন্ডন থাকতেন। এখন মসজিদ ফযল লন্ডনের চারপাশে অনেকগুলো বাড়ীঘর কিনে নেয়া হয়েছে। এসব বাড়ীর কয়েকটি জামা'তের গেস্ট হাউজ। আর অনেকগুলো বাড়ীতে মরকজের কেন্দ্রীয় অফিসগুলো সাজানো হয়েছে। ইমাম মসজিদ ফযল এবং কোন কোন কর্মকর্তার বাসাও সেখানে। এখানে বিশেষ বিশেষ মেহমানদের থাকার ব্যাবস্থা করা হয়। বায়তুল ফুতুহতে সাধারণভাবে অনেক মেহমানদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে এবং অনেক স্থানীয় কর্মকর্তার অফিস। মসজিদ ফযল লন্ডন থেকে বায়তুল ফুতুহ প্রায় ৩০ মিনিটের রাস্তা। ডিয়ার পার্কে কয়েকটি দালান বা বিল্ডিং ক্রয় করা হয়েছে, মসজিদ ফযল থেকে প্রায় ২০ মিনিটের ড্রাইভ। এখানে বাংলা ডেস্ক অবস্থিত, মাখযানে তাসাভীর (ফটো কালেকশন সেন্টার) এবং আরো বেশ কয়েকটি অফিস আছে।

ইসলামাবাদ ১৯৮৬/১৯৮৭ সালে ক্রয় করা প্রায় ২৮ একর জমি। এখানে পূর্ব নির্মিত অনেক বাসা বাড়ী আছে। বিরাট মাঠ আছে। মুরুব্বী সাহেবদের বাসা, অনেক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাসাও এখানে আছে। এখানে চীনা ডেস্ক, আরবী ডেস্কের অফিস। সকলের জন্য গাড়ীর ব্যবস্থা আছে। এখান থেকে বিভিন্ন অফিসে গিয়ে কর্মকর্তারা কর্তব্য পালন করেন। এখান থেকে মসজিদ ফযলের দূরত্ব প্রায় ১ ঘন্টার পথ। এখন জামা'ত অনেক বড় হয়েছে। অনেক বড় বড় অফিস হয়ে গিয়েছে, সকল অফিসে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা কর্মব্যস্ত আছেন। বিশাল কর্মকাণ্ড। প্রত্যেক জুমুআয় বায়তুল ফুতুহতে ৮ থেকে ১০ হাজার নামাযী নামায আদায় করেন। ঈদের দিন পনের হাজারেরও বেশী আহমদী এখানে ঈদের নামায আদায় করেন। আমিও এবার এখানে কুরবানী ঈদের নামায আদায় করার সুযোগ পেলাম, আলহামদুলিল্লাহ।

১লা অক্টোবর হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আই.)-এর সাথে প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ পেলাম। ইতোপূর্বে ২০০৫ইং সালে কাদিয়ান জলসার সময়ে দু'বার ১-১ মিনিটের সাক্ষাত পেয়েছিলাম। এবার হুযূর (আই.)-এর অফিসে বসে মুলাকাতের সূবর্ণ সুযোগ পেলাম। হুযূর (আই.) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধানদের সাথে দেখা করেন। বাদ আসর, এখন শীতের সময় বাদ মাগরিব সাধারণ আহমদীদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাত করেন। হুযূর (আই.) সর্বপ্রথম আমার স্বাস্থ্য বিশেষ করে নকল পা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর নিলেন। পায়ের কষ্টের জন্য ডাক্তার দেখাতে বললেন এবং তিনি (আই.) তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা.শাব্বির আহমদ ভাট্টী সাহেব কে বললেন। ডা. শাব্বির আহমদ ভাট্টী সাহেব প্রতি শুক্রবার আমাকে দেখতেন এবং হুযূর (আই.)-কে রিপোর্ট দিতেন। আমার নকল পা নতুন করে বানানো হল। মানুষ সাধারণত হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাতের সময় বিভিন্ন প্রকারের উপহার নিয়ে যায়। আমিও কিছু নিয়েছিলাম। আমার নকল পায়ের জন্য কয়েকদিন পরপর হাসপাতাল যেতে হত। ফাঁকে ফাঁকে আমি হুযূর (আই.)-এর নির্দেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান দেখতে যেতাম।

আমার ভিসার খবর মওলানা ফিরোজ আলম সাহেব হুযূর (আই.)-কে জানালে হুযূর (আই.) বলেন, আমি যেন ঈদ লন্ডনে গিয়ে

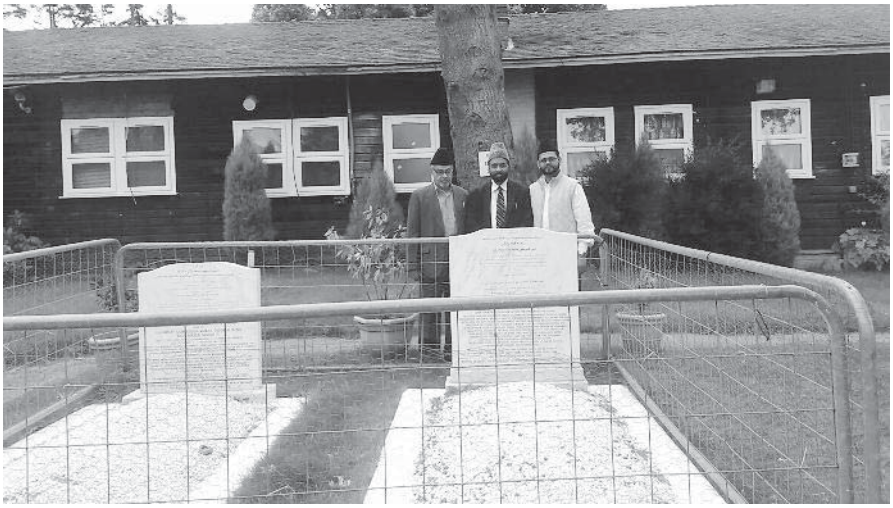

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এবং তাঁর সহধর্মিনীর কবরের পাশে
বাম দিক থেকে- লেখক, মওলানা এনামুল হক কাওসার এবং মৌ. আহমদ তারেক মুবাশ্বের

করি। আমার এতবড় সৌভাগ্য আমার বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

ঈদের দিন দুপুরে হুযূর (আই.)-এর পক্ষ থেকে একটি দাওয়াত হয়। এ দাওয়াতে হুযূরের আত্মীয়স্বজনদের দাওয়াত দেয়া হয়- জামা'তের মাত্র ২/১ জন কে ডাকা হয়। সেখানে জামা'তের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সবার দাওয়াত হয় না। আমার সৌভাগ্য যে, আমার দাওয়াত হয়েছিল। আত্মীয় নন এমন আমি ছিলাম, উসমান চিনি সাহেব, লাহোরের প্রাক্তন আমীর চৌধুরী হামীদ নাসরুল্লাহ্ সাহেব আরো কয়েকজনের দাওয়াত হয়েছিল। হুযূর (আই.) দাওয়াতের পর ফেরত যাচ্ছিলেন পথে দেখা হলে হুযূর (আই.) আমাকে করমর্দনের সুযোগ দিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! ঈদের কয়েকদিন পরে হুযূর (আই.) আমাদের জন্য নিজ কুরবানীর গোস্ত পাঠালেন। মাঝে মাঝে হুযূর (আই.)-এর বাগানের ফল পাঠাতেন।

আমি জানতাম না, কেউ একজন আমাকে পরামর্শ দিলেন অফিসিয়াল মুলাকাতের জন্য আবেদন করতে পারেন, আমি আবেদন করলাম অফিসিয়াল মুলাকাতের। হুযূর (আই.) অনুগ্রহপূর্বক অফিসিয়াল মুলাকাতের সুযোগ দিলেন। আমি ভাল করে কথা বলতে পারব না ভেবে বিভিন্ন বিষয় লিখে নিয়ে গেলাম। হুযূর (আই.) অতিশয় স্নেহপরবশ হয়ে বিষেয়গুলোর ওপর তাঁর বক্তব্য লিখে দিলেন এবং সুন্দর করে বুঝিয়েও বললেন। তাছাড়া জামেয়ার ছাত্রদের ও ওস্তাদদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বুঝিয়ে বললেন। হুযূর (আই.) বিশেষভাবে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললেন (ক) আনুগত্য (খ) ওয়াকফে যিন্দেগীর রূহ (গ) বিনয় এবং (ঘ) বিশ্বস্ততা শেখাতে হবে (এ বিষয়গুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যার দাবী রাখে যা এখানে লেখার সুযোগ নেই)। হুযূর (আই.) বললেন, ছাত্ররা এবং শিক্ষকেরাও আমাকে চিঠিপত্র কম লিখে। তাদের উচিত আরো বেশী লেখা। হুযূর (আই.) আমাকে বললেন, "আপনিও লেখেন না"। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরবর্তীতে এসে চিন্তা করলাম। আমি বুঝলাম যে, আসলে আমার খুব সংক্ষেপে লেখার অভ্যাস। হুযূর (আই.) চান আমরা যেন বিস্তারিত লিখি। হুযূর (আই.) আমাদের কাছে জানতে চান যেন আমাদেরকে হেদায়াত দিতে পারেন এবং দোয়া করতে পারেন। হুযূর (আই.) আমাকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বক্তৃতার একটি অংশ পড়তে দিলেন। আমি পড়তে থাকলাম। হুযূর (আই.) অনেক সময় দিলেন।

হুযূরের সাথে বারবার সাক্ষাতে বুঝলাম যে, হুযূর প্রাণখুলে কথা বলেন, যে বিষয়ে কথা বলেন সবিস্তারে কথা বলেন, বলার সুযোগও দেন। কথা বলার সময় মনে হয় যে, হুযূরের কাছে সময়ের কোন অভাব নেই। আমি তো অনেক কথা বলতাম, তারপরও সময় শেষ হচ্ছিল না। আমি অবশ্য নিয়্যত করে গিয়েছি যে, কম কথা বলব, হুযূর বলবেন, আমি শুনব। হুযূর কথা বলে আমার কথা বলা সহজ করে দিলেন। আমি কোথায় কোথায় গেলাম, কি দেখলাম, জিজ্ঞাসা করলেন। আরো বড় বড় জামা'তগুলো দেখার বাকী ছিল, সেগুলোও দেখতে বললেন। দেখতে বললেন অর্থ এই যে, ব্যবস্থা করলেন। নতুন নকল পা বানাবার কারনে কয়েকদিন পর পর হাসপাতাল যেতে হত। আর ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন জামা'ত পরিদর্শনে যেতাম।

প্রথমত: জামেয়া আহমদীয়া ইউ.কে দেখলাম। প্রায় একত্রিশ একর জমি। পাহাড়ের ওপর ঘন জঙ্গলের মত গাছপালায় ঘেরা অতি চমৎকার জায়গা। এটি পুরাতন হোটেল ছিল, আমাদের কিনে নেয়ার পর জামেয়ার জন্য ঠিকঠাক করে নেয়া হয়েছে। ছাত্রদের থাকার জন্য হোস্টেল আছে। ক্লাস রুম, লাইব্রেরী ইত্যাদী সবই সুন্দর। শিক্ষকগণ রাবওয়াহ্ জামেয়া থেকে পাশ করা, যোগ্য এবং উপযুক্ত। শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাৎ হল, আলাপ হল। প্রিন্সিপাল সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ভাগ্নে, সাহেবযাদা মির্যা এনাম আহমদ সাহেব। উচ্চ শিক্ষিত, অল্পবয়সী কিন্তু দরবেশ প্রকৃতির মানুষ। আমার সাথে এমনভাবে কথা বললেন, যেন আমি অনেক বড় সম্মানিত ব্যক্তি আর তিনি খুব সাধারণ মানুষ। হযরত সাহেবের খানদানের এটিই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তাঁর পিতা সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব রাবওয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একজন কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা। প্রিন্সিপাল সাহেবের সাথে ছবি নিলাম এই শর্তে যে, এ ছবি প্রকাশ করা যাবে না। হুযূর (আই.) প্রায়শ জামেয়ায় যান ও ছাত্রদের, শিক্ষকদের হেদায়াত দেন। শিক্ষকদের ও ছাত্রদের নিয়মিত হুযূরের সাথে দেখা করতে হয়।

যেখানে যেখানে গেলাম সকল স্থানের অনেক ছবি ক্যামেরাবন্দি আছে। আমি জীবনে কখনও ছবিকে গুরুত্ব দেই নি, কিন্তু এবার গুরুত্ব দিতে হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) একটি বড় বিল্ডিং এর অনেকগুলো বড় বড় হলঘর বরাদ্দ দিয়েছেন, "মাখযানে তাসাবীর"- ছবি ভান্ডার। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান একজন যুবক ওমায়ের আলীম সাহেবকে কয়েক বছর পড়াশোনা করিয়েছেন- অনেক দামী ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়েছেন। হুযূর নিজের নিগরানীতে রেখেছেন। হাজার হাজার ছবি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জামা'তের শহীদদের ছবি সংরক্ষিত হয়েছে। আমাদের বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন শহীদের ছবিও সেখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

(চলবে)

হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর নামে দ্বিতীয় বিয়ে প্রসঙ্গে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর লেখা পত্র

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

শ্রদ্ধেয় সম্মানিত প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আপনার পত্র পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আপনার এবং আপনার নতুন স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য বন্ধন, ঐক্য ও ভালোবাসা সর্বাধিক বৃদ্ধি করুন এবং সৎ-সালেহ্ সন্তান-সন্ততি দান করুন, আমীন, সুম্মা আমীন। প্রথমা স্ত্রীরা সচরাচর এ ধরনের বিষয়াদিতে প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে চরম সীমায় কুধাণার বশবর্তী হয়ে নিজেদের জীবন ও সুখ-শান্তির বিনাশ ঘটিয়ে থাকে।

স্ত্রীদের ওপর তৌহীদের অকাট্য দলিল

'ওয়াহ্‌দাহু-লাশরিক' হওয়া খোদার গুণ। কিন্তু স্ত্রীরাও কখনো শরীক পছন্দ করে না। এক বুযূর্গ বলেন, তাঁর প্রতিবেশী এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অনেক কঠোর ও কর্কশ আচরণ করতো। এক পর্যায়ে সে দ্বিতীয় বিয়ে করতে মনস্থ করলো। এতে সে স্ত্রী অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে স্বামীকে বললো, 'আমি তোমার সব যাতনা সহ্য করেছি কিন্তু এই দুঃখ আর সহ্য করা যায় না যে, তুমি আমার স্বামী হয়ে এখন দ্বিতীয় স্ত্রীকে আমার সঙ্গে শরীক করবে।' তিনি বলেন, 'তার সে কথা আমার হৃদয়ে বড়ই গভীর দাগ কাটলো, বেদনাত্মক প্রভাব বিস্তার করলো। আমি সে কথার সদৃশ বিষয় কুরআন করীমে খুঁজে দেখতে চাইলাম। তখন এ আয়াতটি খুঁজে পেলাম ঃ ওয়া ইয়াগফিরু

মা দূনা যালিক।' (সূরা আন নিসা: ১১৭) এ (অর্থাৎ শরীক করা) ছাড়া আর সবই তিনি ক্ষমা করেন-অনুবাদক।

এ বিষয়টি বাহ্যত বড়ই নাজুক। দেখা যায়, পুরুষের আত্মমর্যাদাভিমান যেমন চায় না যে, তার স্ত্রী তার এবং অন্য কারও মাঝে ভাগাভাগী হোক, তেমনি স্ত্রীর মর্যাদাভিমানও চায় না, তার স্বামী তার এবং অপর কারও মাঝে বিভক্ত হোক। কিন্তু আমি খুব ভালোভাবে জানি, খোদা তা'লার শিক্ষায় কোন ত্রুটি নেই। এবং তা মানবপ্রকৃতি ও স্বভাব বিরুদ্ধও নয়। এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ গভেষণালব্ধ সত্য এটাই যে, পুরুষের মর্যাদাভিমান এমন এক প্রকৃত বাস্তব ও পরিপূর্ণ মর্যাদাভিমান, যা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন হলে প্রকৃতপক্ষেই এর কোন প্রতিকার নেই। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদাভিমান পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং সম্পূর্ণ সন্দেহাত্মক এবং ক্ষিয়মাণ।

মা'রেফতের গুঢ়তত্ত্ব

এ ক্ষেত্রে সেই গুঢ়তত্ত্ব যা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন তা এক মা'রেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) প্রদানকারী গুঢ়তত্ত্ব বিশেষ। কেননা মহানবী (সা.)-এর প্রস্তাব দিলে হযরত উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন এ ওজর-আপত্তি জানালেন, 'আপনার একাধিক স্ত্রী রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হবে বলে খেয়াল আছে আর আমি একজন আত্মমর্যাদাভিমানী এমন নারী, যে দ্বিতীয় কোন স্ত্রী সইতে পারে না।' তখন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আমি তোমার জন্য দোয়া করবো, যেন খোদা তা'লা তোমার এই মর্যাদাভিমান দূর করে দেন এবং ধৈর্য দান করেন।'

কাজেই আপনিও দোয়ায় মশগুল থাকুন। নতুন স্ত্রীর মনোরঞ্জন অত্যাবশ্যক। কেননা সে হচ্ছে মেহমানের মত। তার ক্ষেত্রে আপনার আখলাক ও সদ্ব্যবহার উচ্চতর পর্যায়ের হওয়া দরকার। তার সাথে আপনি অকৃত্রিম মেলা-মেশা ও সহবাস করুন এবং আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর কাছে চান, তিনি যেন নিজ অনুগ্রহে তার সাথে আপনার নির্মল-নিখাদ ভালোবাসা ও প্রেমভরা সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেন। কেননা এসব কিছুই আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর আয়ত্তাধীন। এখন তার সাথে বিয়ের মাধ্যমে আপনার এক নতুন জীবন শুরু হয়েছে। আর যেহেতু মানুষ জগতে চিরকালের জন্য আসে নি, কাজেই ভবিষ্যত বংশগত বরকত ও আশিস প্রকাশিত হওয়ার জন্য এখন এ সম্পর্কের ওপরই সব আশা-ভরসা। খোদা তা'লা আপনার জন্য এক মুবারক (আশিসমণ্ডিত) করুন। আমি এ মহল্লাবাসী বিশেষ ওয়াকেফহাল ও গোপন খবরাখবর জানা লোকদের কাছ থেকে এ মেয়েটির সম্পর্কে এ মর্মে অনেক প্রশংসা শুনেছি যে, সে স্বভাবত সৎ পুণ্যবতী, সতী-সাধ্বী ও প্রশংসনীয় সদ্‌গুণাবলীর আধার। তার তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। আপনি তাকে নিজে পড়াবেন, কেননা তার সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভা অতি উত্তম বলে মনে হয়। বস্তুত আল্লাহ্ জাল্লাশানুহুর এটা অতি অনুগ্রহ ও ইহ্‌সান যে, তিনি এ জোড়া মিলিয়েছেন। নচেৎ যোগ্য ও সৎ মানুষের এ অভাব ও দুর্ভিক্ষ কালে এমনটি ঘটা অসম্ভব বিষয়াবলীরই অন্তর্ভুক্ত। আপনার পত্রটি থেকে কিছুই জানা গেল না, ২০ মার্চ ১৮৮৯ ইং পর্যন্ত ছুটি পাবেন কি না। আপনি যদি ২০ কি ২২ তারিখে আসেন অর্থাৎ রবিবার এখানে থাকেন তাহলে বাবু মুহাম্মদ সাহেবও আপনার সাথে দেখা করবেন। এ অধম ১৫ মার্চ, ১৮৮৯ ইং তারিখে দু' তিন দিনের জন্য হুশিয়ারপুর যাওয়ার ইচ্ছা রাখে এবং ১৯ অথবা ২০ মার্চ তারিখে অবশ্যই ইনশাআল্লাহ্ ফিরে আসবে। সাহেযাদা ইফতিখার আহমদ এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই কুশলে আছেন। গতকাল নগত সাত টাকা এবং কিছু কাপড় আমার জন্য পাঠিয়েছেন, যা তাঁর জোরালো অনুরোধের দরুন গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াস্‌সালাম

বিনীত
গোলাম আহমদ
(আল হাকাম, ৩১ মে, ১৯০৩, পৃষ্ঠা-৪)

বিজ্ঞপ্তি

২০ ডিসেম্বরের মধ্যে ওয়াকফে জাদীদের ২০১৪ সনের চাঁদা আদায় প্রসঙ্গে

আপনারা অবগত আছেন যে, এই বৎসরের প্রথমেই হুযূর (আই.) সকল আহমদীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, জামা'তের কেহই যাতে এই ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার বাইরে না থাকেন। অর্থাৎ জামা'তের ১০০% সদস্য যাতে এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

আপনাদের সকলের নিকট আবেদন, আপনারা অতিসত্ত্বর চাঁদা আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। জামা'তের সাথে যোগাযোগ তেমন নেই তাদের নিকটও খলীফার এই পয়গাম পৌঁছান ও তাদেরকে এই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করুন (চাঁদা যত টাকাই দিন না কেন) এবং নও মোবাঈনসহ মোট আদায়কারীর সংখ্যা ১০০% উন্নীত করুন। এ ব্যাপারে জামা'তের সকল অঙ্গ সংগঠন ও মুরব্বী মোয়াল্লেমগণের সহযোগিতা গ্রহণ করুন।

চাঁদা আদায়ের রিপোর্ট আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০১৪ ইং তারিখের মধ্যে দপ্তরে প্রেরণ করুন, যাতে যথা সময়ে হুযূর (আই.) দপ্তরে সমস্ত রিপোর্ট প্রেরণ করা যায়।

আমাদের সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা আমাদের যুগ খলীফার প্রত্যেকটি নির্দেশ পালনে স্বচেষ্ট হই ও হুযূরের দোয়া ও বরকতের অংশীদার হই।

ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
বি: দ্র: প্রয়োজনে ০১৭১৪০৮৫০৭০ যোগাযোগ করুন বা SMS করুন।

ইসলামের সাথে জীবনের সম্পর্ক

মাহমুদ আহমদ সুমন

প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে ইসলাম শব্দের উৎপত্তি ও এর অর্থ। ইসলাম একটি আরবি পরিভাষা। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ আনুগত্য করা, আত্মসমর্পণ করা, অনুগত হওয়া, কোন কিছু মাথা পেতে নেয়া। এ শব্দটি সালম, সিলম বা সিলমুন মূল ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। ইসলাম শব্দের মূল ধাতু 'সালম' যার এক অর্থ শান্তি, সন্ধি, সমর্পন ও নিরাপত্তা। যেহেতু আত্মসমর্পণের মাধ্যমে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ হয়, তাই একে ইসলাম বলা হয়।

অন্য কথায়, ইসলাম এর অর্থ আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নির্দেশ মান্য করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করা। আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের মূলতত্ত্ব নিহিত রয়েছে 'ইসলাম' শব্দটিতে। আরবি ভাষায় তাই ইসলাম বলতে বুঝায় আনুগত্য, বাধ্যতা ও আত্মসমর্পণ। ইসলাম গ্রহণ করার ফলে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পণ করতে হয়।

অতএব, ইসলামের মূল মর্মবাণী হলো মানুষের সর্বস্ব আল্লাহ্ তা'লার কাছে সোপর্দ করে দেয়া। তার সমস্ত শক্তি, তার যাবতীয় কামনা বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-আবেগ, তার সমস্ত প্রিয় বস্তু এক কথায় মাথার চুল হতে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত যত কিছু আছে সব কিছুকে আল্লাহ্ তা'লার কাছে অর্পণ করার নামই হলো ইসলাম। কুরআনের ভাষায় ইসলাম মানে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া যে জীবনাদর্শের লক্ষ্য তারই নাম ইসলাম। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, প্রতিস্তরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের বিধিনিষেধ পালন করা, তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা-এ লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার নামই ইসলাম।

সমাজ ও রাষ্ট্রকে অশান্তি, জুলুম ও বিশৃঙ্খলা মুক্ত করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তির ধর্ম। মানুষ যদি সত্যিই শান্তি পেতে চায় তাহলে তার নিজের ইচ্ছে মতো জীবন যাপন না করে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান মেনে চলতে হবে। তাই আল্লাহ্ তাঁর প্রেরিত বিধানের নাম রেখেছেন ইসলাম বা শান্তি।

ইসলাম শব্দটির অর্থের মধ্যে বিশেষ গুণের পরিচয় পরিস্ফুটিত। ইসলামের তুলনা ইসলাম কেবল নিজেই। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন ব্যক্তি বিশেষের আবিষ্কার নয়, কোন জাতির নামানুসারেও এ মতাদর্শের নাম হয় নি। ইসলাম নামটি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত। তাই ইসলাম নামটি অনেক গুরুত্ব বহণ করে। আর ইসলামের সাথে জীবনের সম্পর্ক সুগভীর।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম অর্থাৎ Islam is the complete code of life। সব সংঘাত সংঘর্ষের চিরন্তন ও মহাসমন্বয় হচ্ছে ইসলাম। জীবনাদর্শ, জীবন ব্যবস্থা ও জীবন বিধান হিসেবে ইসলামে রয়েছে সব সমস্যার সঠিক সমাধান। এতে রয়েছে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যার সমাধান আর মৃত্যুর পর আখেরাতের অনন্ত জীবনে নিশ্চিত সুখ-শান্তি লাভের উপায়। ইসলাম মানুষের চলার পথের সন্ধানদাতা, উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন এবং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জন তথা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হাসিলের একমাত্র পন্থা। এর ব্যাপ্তী জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সব ক্ষেত্রেই ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধিকার। তাই ইসলাম মানুষের সঠিক পথের দিশারী, দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বাঙ্গীণ ও পূণাঙ্গ একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ২০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***"ইন্নাদ দিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম"*** অর্থাৎ ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র জীবনাদর্শ।

অপর এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ***"আল***

ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাযিতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা" অর্থাৎ 'আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের ওপর আমার যাবতীয় নেয়ামত সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম' (সূরা আল মায়েদা: ৪)। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ ইসলামকে মানবতার জন্য নেয়ামত হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষের জীবনের সব সমস্যার সমাধান রয়েছে।

এখন হয়তো কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ইসলাম গ্রহণ করলে আমাদের কী লাভ? এক কথায় বলা যায় ইসলাম গ্রহণ করলে অনেক লাভ রয়েছে। প্রথম যে লাভ তাহলো ইসলাম গ্রহণ করলে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্য লাভ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে 'মহানবী (সা.) বলেছেন, 'যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ইসলাম খাঁটি হয়, আল্লাহ্ তা দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেন সে পূর্বে যা অপরাধ করেছে। অত:পর তার সৎকাজ হয় অসৎ কাজের বিনিময়, সৎকাজ তার দশগুণ হতে সাত শত গুণ বরং বহু গুণ পর্যন্ত আর অসৎকাজ তার একগুণ মাত্র, তবে আল্লাহ্ যাকে ছেড়ে দেন তার একগুণের শাস্তিও হবে না' (বুখারী)।

আর হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, "হাঁ, সেই মুবারক ধর্ম যার নাম ইসলাম, এটাই একমাত্র ধর্ম যা মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্যে পৌঁছায়। এটাই একমাত্র ধর্ম যা মানব প্রকৃতির সকল চাহিদা পূরণ করে" (তবলীগে রেসালত)।

আসলে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করে তাহলে মূলত সে নিজেকেই অনুগ্রহীত করে থাকে। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "তারা ইসলাম গ্রহণ করে তোমারা প্রতি অনুগ্রহ করেছে বলে মনে করে। তুমি বল, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছ বলে জাহির করো না। পক্ষান্তরে তোমাদের মু'মিন হওয়ার দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকলে একথা স্বীকার কর আল্লাহ্ই প্রকৃত ঈমানের দিকে তোমাদের পরিচালিত করে তোমাদের ওপরই অনুগ্রহ করেছেন" (সূরা আল হুজুরাত: ১৮)।

সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই বিভিন্ন নবী রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু ইসলাম তার সত্য ও ন্যায়ের শাশ্বত সৌন্দর্যের আলোকে পথ দেখিয়ে চলেছে সমগ্র মানব জাতিকে। মানুষের মধ্যে যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও অনুসন্ধানী, কেবল তারাই খুঁজে পেয়েছেন সত্যের ও শান্তির সন্ধান, খুঁজে পেয়েছেন একমাত্র প্রতিপালক আল্লাহ্কে এবং জেনেছেন নিজের চিরস্থায়ী গন্তব্যের আসল ঠিকানা।

অত্যাধুনিক কম্পিউটার চালিত যান্ত্রিক সভ্যতার এ যুগে মানুষ আজ কঠিনতম বাস্তবতার শিকার। সবাই চায় সচ্ছলতা, চায় শান্তি। বস্তুত মানুষ আত্মিক শান্তির পিয়াসী এবং বেঁচে থাকার জন্য এটি অপরিহার্য। মহান আল্লাহ্র মনোনীত ধর্ম দ্বীন ইসলাম সেই অনন্ত শান্তির বাণীই প্রচার করছে। তাইত শাশ্বত ধর্ম দ্বীন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর আদর্শে মানুষ যুগ যুগ ধরে ইসলাম গ্রহণ করে আসছে।

ইসলাম যে দিনের পর দিন উন্নতি করেই যাচ্ছে এর কারণ কি? দিনের পর দিন ইসলামের যে উন্নতি হচ্ছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে, ইসলামই একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার মনোনিত ধর্ম, তাই এ ধর্মের উন্নতি অবধারিত। ইসলামের উন্নতি সম্পর্কে অনেকেই অনেক মন্তব্যও করেছেন। যেমন ইংল্যান্ডের জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক জর্জ বার্নার্ড শ' ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রচারিত ধর্ম ইসলাম আগামী দিনের ইউরোপবাসীদের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে। হতোমধ্যে আজকের ইউরোপবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছে। (জেনুইন ইসলাম, ১ম খন্ড)

তিনি আরো বলেছিলেন, 'সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ, বিশেষ করে ইংল্যান্ড ইসলাম গ্রহণ না করে থাকতে পারবে না'।

বর্তমান বিশ্ব, বিশেষত খ্রিষ্টবাদের প্রাণকেন্দ্র ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকালে সকলে জর্জ বার্নার্ড শ'-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর বাস্তবতা দেখতে পাবে। সত্য আর শান্তির অন্বেষায় পাগলপারা হয়ে মানুষ আজ ছুটে আসছে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের দিকে, আশ্রয় নিচ্ছে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে, আনুগত্য শিকার করছে যুগ খলীফার। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম জনসংখ্যা আজ তিন কোটির ওপরে।

১৯৯৫ সালের ১০ ডিসেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত পত্রিকা 'লস এঞ্জেলস টাইমস' পাশ্চাত্যে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে একটি সবিস্তার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ইসলাম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় সর্বাধিক দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর কমসে কম এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হারে মুসলমানের সংখ্যা বাড়ছে। মুসলমানদের প্রবৃদ্ধির এ গতি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আগামী শতকের সূচনা পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা মার্কিন ইহুদিদের ছাড়িয়ে যাবে এবং খ্রিষ্টান ধর্মের পর ইসলামই হবে আমেরিকার সর্ববৃহৎ ধর্ম"।

ইউ এস এ টুডে পত্রিকার ২৭ জানুয়ারী, ১৯৯৪ সংখ্যার ভাষ্য হচ্ছে-"ইসলাম আমেরিকানদের জোয়ারের টানের মত প্রবল শক্তিতে কাছে টেনে নিচ্ছে। আমেরিকানরা এ সার্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতি ক্রমশই ঝুঁকে পড়ছে"। দেখা যায় গত ২৫ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় প্রত্যেকটি অঞ্চলে বিশাল বিশাল মসজিদ নির্মিত হয়েছে। শিশু-কিশোরদের দ্বীনি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষা কেন্দ্র।

ইসলামের যৌক্তিকতা, সরলতা, পাপের প্রলোভনের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা, ক্ষতিকারক পানাহার থেকে বিরত থাকা, অন্ধবিশ্বাস থেকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা, মনকে খোদাভীরু করে ইবাদতের দিকে মনোযোগ এনে মানসিক শান্তি প্রদানের ক্ষমতা এক কথায় ইসলামের সৌন্দর্য আজ ভোগবিলাসী বস্তুতান্ত্রিক অশান্ত অপরিতৃপ্ত বিশ্ববাসীকে আহমদীয়া জামা'তের সদস্যরা মুগ্ধ করছে আর এর ফলে তারা আকর্ষিত হচ্ছে ইসলামের দিকে। এই যে লাখ লাখ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে এর আরেক কারণ রয়েছে, তা হলো-পাশ্চাত্যের লোকেরা নিজেরাই সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে লক্ষ্য করে নিরাশ হয় পড়েছে। তাতে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ পথহারা মানুষ সঠিক পথ পেয়ে শান্তির ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করার সৌভাগ্য পাচ্ছে। কেউ কেউ হয়তোবা বলতে পারেন যে, বর্তমানে বিভিন্ন ধর্ম থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করছেন, তারা কোন লোভে পড়ে বা ঝোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করছেন, আসলে তা নয়। এরা ব্যাপক অধ্যয়ন, গবেষণা, পর্যালোচনার পর ইসলামের

সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করছেন। আর যারা প্রাশ্চাত্যে ইসলাম গ্রহণ করছেন তারা কোন সাধারণ মানুষ নোন, তারা সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, এদের মধ্যে রয়েছেন, রাষ্ট্রপ্রধান, ডক্টরেট, প্রফেসর, চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তারা সবাই ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাকে উপলব্ধি করেই ইসলাম গ্রহণ করছেন।

ইসলাম কেবলমাত্র গুটিকতক আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়। হিন্দু ধর্মে যেমন বার মাসে তের পর্ব, এর বাইরে তাদের আর কোন ধর্মকর্ম নেই। অনেকে একই কায়দায় ইসলামকে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব মতাদর্শ বলে মনে করেন। ইসলাম বার মাসের তের পর্বের আদর্শ নয়। ইসলামের ইবাদত সার্বক্ষণিক, উঠতে, বসতে, চলতে, শুইতে, গৃহে, সমাজে, অফিসে, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে এক কথায় সর্বক্ষেত্রে। মানুষের জীবন, প্রয়োজন এবং কর্মপ্রবাহের কোন একটি দিক সম্বন্ধেও ইসলাম উদাসীন নয়।

এছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থা মানব জাতির জন্য একটা সাময়িক ব্যবস্থা নয়। ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ের জন্যই কেবল তা প্রেরিত হয় নি। কোন বিশেষ পরিবেশ বা জেনারেশনের জন্যও তা নির্দিষ্ট হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে গতিশীল মানবজীবনের জন্য একটা মৌলিক বিধান। মানব সভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তার জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমন এক বৈশিষ্ট্য দিয়েই ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সত্য পথের অনুসৃতির মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হতে পারে। নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত এ বিধান অনুসরণ করেই মানুষ সম্মানিত হতে পারে। অনাগত মানব গোষ্ঠীর জন্য ইসলাম বিশ্বজনীন সদাসত্য বিধান হিসেবে বিদ্যমান।

ইসলাম প্রকৃতই যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দেয়, তা মহানবী (সা.) নিজে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। ইসলামের গৌরবজনক ইতিহাস, অনুশাসন, ঐতিহ্যবাহী জীবন-ব্যবস্থায় নারীর মূল্যায়ণ, পুরুষসহ সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রশ্ন ও প্রেক্ষিত এবং সমাধান দেখে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সবাই এ কথাও বলতে বাধ্য হয়েছিল, ইসলামই একমাত্র শান্তির ধর্ম হতে পারে। তাই সবাই ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এই শান্তির ধর্মে কোন ধরণের বল প্রয়োগের শিক্ষা নেই।

কাউকে হত্যার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা কতই না অতুলনীয়। ইসলাম কাউকে হত্যা করার শিক্ষা দেয় না। হত্যার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা হল–"আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করলে এর প্রতিফল হবে জাহান্নাম। সেখান সে দীর্ঘকাল থাকবে। আর আল্লাহ্ তার প্রতি রাগান্বিত। তিনি তাকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্য এক মহা আযাব প্রস্তুত করে রেখেছেন" (সূরা আন নিসা : ৯৪)।

কাউকে হত্যার ব্যাপারে ইসলামের নবী বলেছেন, "কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে মোকদ্দমার ফয়সালা করা হবে, তা হবে রক্তপাত (হত্যা) সম্পর্কিত" (বুখারী)। কাউকে হত্যা করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, শুধু নিষেধ করেই শেষ করে নাই, বরং যারা এসব সন্ত্রাসী ও জঙ্গি-কার্যক্রম করে, তাদের শাস্তি কত ভয়াবহ, সে-সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষা কত উন্নত যে, বল-প্রয়োগ করে ইসলামের প্রচার করতে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে।

এত উন্নত শিক্ষা ইসলামের থাকা সত্বেও আজ গুটিকতক উন্মাদ ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অভিযোগ করে যে, ইসলাম নাকি সন্ত্রাসের শিক্ষা দেয়। অথচ ইসলাম সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সব সময় সোচ্চার।

যদি আমরা ইসলাম ও রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখতে পাই, কতই না উন্নত শিক্ষা আমাদের নবী করীম (সা.)-এর। আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে, কিন্তু তিনি পাল্টা প্রতিশোধ না নিয়ে করেছেন ক্ষমা। দু'হাত তুলে শত্রুদের সংশোধনের জন্য দোয়া করেছেন। আমরা দেখতে পাই, কেউ কেউ এমনও আছেন, যারা হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জিহাদের কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি ইসলামের জন্য অস্ত্র হাতে নিয়েছেন। হ্যাঁ, হযরত রসূল করীম (সা) জিহাদ করেছেন ঠিকই, কিন্তু তিনি তা কেন করেছেন, তাও বুঝতে হবে। তিনি কি কোন লোভে বা রাজত্ব দখলের আশায় জিহাদ বা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন? মোটেও না। তিনি আল্লাহ্পাকের আদেশে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

ইসলামের নির্দেশিত সমস্ত কর্ম সম্পাদন করতে হয় সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খলার মাধ্যমে। ইসলামে খামখেয়ালীর কোন অবকাশ নেই। ইসলাম দুনিয়ার জমিনে এসেছে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তদানীন্তন আরবের করুণ, বিশৃঙ্খল, জাহেলী ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আমরা শেষে এই কথাই বলতে পারি, ইসলামই মানুষকে সকল প্রকার অশান্তি থেকে মুক্ত করে শান্তি দিতে পারে। তাই আসুন! আমরা সবাই এই শান্তিময় ধর্মের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে নিজেদের জীবন পরিচালনা করি।

masumon83@yahoo.com

মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৬তম বার্ষিক ইজতেমা-২০১৪ সফল হোক

মহান আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে ও হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর আশিসক্রমে আগামী ২৫, ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ-এর ৩৬তম বার্ষিক ইজতেমা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্র দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। উক্ত ইজতেমার প্রথম অধিবেশন ২৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় শুরু হবে। ইজতেমায় সকল আনসারুল্লাহ সদস্যদের যোগদান করার আহ্বান জানাচ্ছি।

ইজতেমার সার্বিক সফলতার জন্য সকলের কাছে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

চেয়ারম্যান, ৩৬তম ইজতেমা কমিটি
মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ

দরবেশে কাদিয়ানের পটভূমি

দরবেশ মওলানা আব্দুল মোতালেব

মওলানা আব্দুল মোতালেব

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(তৃতীয় কিস্তি)

বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম নাওঘাট। তালশহর রেলষ্টেশনের নিকটে অবস্থিত। এ গ্রামের এক কিলোমিটারের মাঝে তারুয়া এবং ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রাম বিদ্যমান। তারুয়া গ্রামের মুন্সী আহমদ উল্লাহ্ ও মুন্সী আউসাফ আলী ১৯১৫ সালে আখেরী জামানায় আবির্ভূত হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সত্যতা উপলব্ধি করে আহমদী সিলসিলায় দাখিল হওয়ার পর এলাকায় আহমদীয়াতের পরিচিতির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রামের আশেকে মসীহ আব্দুর রহমান সরকার আহমদী হওয়ার প্রেক্ষিতে আহমদীয়াতের চর্চা বৃদ্ধি পায়।

সে সময় নাওঘাটের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন মুন্সী রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে মুন্সী দায়েমুল্লাহ্। তাঁর বড় জোতধারী ছিল। পাঁচ গ্রাম জোরে ছিল তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও পরিচিতি। গ্রামের বিচার কার্যের মাতাব্বর ছিলেন তিনি। তাঁর ছিল দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান চার ছেলে ও দুই মেয়ে। তারা হলেন–(১) আশরাফুন্নেসা, (২) আব্দুল আলী (৩) মৈয়ধর আলী বেপারী, (৪) আসগর আলী, (৫) নজব আলী মোড়ল এবং (৬) ফুল বানু। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম খাতেবুন্নেসা ওরফে মিয়ার মা। এ স্ত্রীর গর্ভে দু'টি ছেলের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন (১) আব্দুল মোতালেব এবং (২) মোহাম্মদ মহসীন।

দায়েমুল্লাহ্ সাহেব জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তিনি সন্তানদেরকে শৈশব থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় মানুষ করেন। গ্রামের মৌলভী সাহেবের নিকট নামায, রোযাসহ পবিত্র কুরআন নাযেরা শিক্ষা দেয়া হয়। উপরন্তু ক'জন ছেলেকে তিনি নিকটবর্তী তালশহর হাই স্কুলে প্রাইমারী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাদের মধ্যে আব্দুল মোতালেবের মাঝে ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় শিক্ষার একনিষ্ঠ আগ্রহ সৃষ্টি হয়। জ্ঞানা অর্জনে বুৎপত্তি লাভের প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। তিনি উত্তম মানবীয় গুণাবলীর ধার্মীক ছেলে হিসেবে অভিভাবকদের দৃষ্টি নন্দিত ও স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। গ্রামের পাকা চুলওয়ালা মুরুব্বীদের নিকট অন্য দশটি ছেলে থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

তখন দায়েমুল্লাহ্ সাহেবের পরিবার মাছীহাতা গ্রামের পীরের মুরীদান ছিলেন। পীর সাহেব তাদের বাড়ী আসলে অনেকেই তার পা ছোঁয়ে সালাম করতেন। কিন্তু মোতালেব সাহেবের কচিমনে এটা শির্ক মনে হয়। তাই তিনি অভিভাবকদের উপদেশ পালনে কখনও কদমবুছি করেন নি। আল্লাহ্ তা'লা বাল্যকাল থেকে তাঁকে শির্ক থেকে রক্ষা করেন।

দায়েমুল্লাহ্ সাহেবের বড় মেয়ে আশরাফুন্নেসা বিবাহযোগ্য হলে তিনি সুপাত্রের সন্ধান করে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া গ্রামের আব্দুর রহমান সরকারের নিকট বিয়ে দেন। পাত্র ধার্মিক, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং তাঁর আযানের ধ্বনী সুমধুর ছিল বলেই তাঁকে পছন্দ করেন। তখন আব্দুর রহমান সরকার আহমদী ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রথম আমীর মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের ছাত্র এবং তাঁর তবলীগে বয়আত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তাই কাদিয়ানী ছেলের নিকট মেয়ে বিয়ে দেয়ার প্রাক্কালে গ্রামের লোকজন তাঁকে বলেন– 'আপনি মুসলমান হয়ে কাদিয়ানী কাফের ছেলের নিকট মেয়ে বিয়ে দিচ্ছেন'। উত্তরে তিনি বলেন– 'একজন ভাল সুপাত্রের নিকট মেয়ে বিয়ে দিচ্ছি। এটাই বড় কথা'। তবে এলাকায় তার বেশি প্রভাব থাকার কারণে লোকজন প্রত্যহ তাঁর বিরোধিতা করতে সাহস পায় নি।

আব্দুর রহমান সাহেব আহমদী হওয়ার পর তবলীগই ছিল তাঁর স্বপ্ন সাধনা। শ্বশুর বাড়ি এসে আহমদীয়াতের সত্যতা প্রচার করতেন। ফলে দায়েমুল্লাহ্ সাহেবের বড় ভাই মুন্সী নায়েব উল্লাহ্‌র ছেলে আব্দুল হামিদ ১৯৩৪ সালে আল্লাহ্ তা'লার হেদায়াত লাভে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। কিন্তু তাঁর ওপর প্রচন্ড মুখালেফাত আসে। গ্রামের লোকজন তাঁকে সামাজিক ভাবে বয়কট করে। এমন কি আগুন পানি লেনদেন বন্ধ করে দেয়। কিন্তু তিনি সকল বিরোধিতাকে ঈমানের পরীক্ষার সোপান হিসেবে বরণ করে নেন। তৎকালীন বঙ্গীয় মোবাল্লেগ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভাদুঘর গ্রামের মওলানা আজিজ উদ্দিন সাহেবকে বাড়ি নিয়ে এসে তবলীগি সভা করতে থাকেন।

মওলানা সাহেব আর সুমধুর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আহমদীয়াতের সত্যতার ওপর আলোচনা করতেন। তখন অনেকে তাঁর বিরোধিতা করলেও ধর্মপরায়ণ বালক আব্দুল মোতালেবের কচিমনে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তিনি অভিভাবক ও আত্মীয় স্বজনের রক্ত চোখ উপেক্ষা করে মওলানা সাহেব ও চাচাতো ভাই আব্দুল হামিদের নিকট থেকে সত্যতা যাচাইয়ে অনুপ্রাণিত হন। ফলে তাঁর পবিত্র মনে অল্প দিনের মধ্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা পূর্ণাঙ্গভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়–আল্লাহ্ তা'লা যাকে হেদায়াত দেন বস্তুত: তিনিই হেদায়াত প্রাপ্ত হন (সূরা আল কাহফ : ১৮)। আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি ঈমান আনতে পারে না এবং তিনি তাঁর কোপ তাদের ওপর বর্ষণ করেন যারা বুদ্ধি খাঁটায় না (সূরা ইউনুস : ১০১)। যে কেউ আমাদের সাথে সাক্ষাতের বাসনা নিয়ে পরিশ্রম সহকারে কাজ করে আমরা নিশ্চয় তাদেরকে পথ প্রদর্শন করি এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন (আল্ আন্‌কাবুত : ৭০)। ফলে পবিত্র চিত্তের মানুষ মোতালেব সাহেব মওলানা আজিজ উদ্দিন সাহেবের উপদেশানুসারে ১৯৩৬ সালে বয়আত করে আহমদীয়া জামা'তভুক্ত হন। তাঁর জন্ম তারিখ ১৭ মার্চ ১৯২৪ সাল। সে হিসেবে তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র বার বছর।

বালক আব্দুল মোতালেব আহমদী হওয়ার পর অভিভাবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তখন তাঁর পিতা জীবিত ছিলেন না। বিধবা মাতার শুহিলপুর গ্রামের শেখ শমসের আলীর সাথে বিয়ে হয়। ফলে তাঁর অভিভাবক ছিলেন সৎ বড় ভাই আব্দুল আলী। তিনি তাকে আহমদী ছাড়ার জন্য বিভিন্ন ভাবে অত্যাচার করে। তার প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেন। মৌলভীরা কাফের হয়ে গেছে বলে কুফরী ফতোয়ার ঝড় তোলে। তাকে গ্রাম ছাড়া করার আন্দোলন শুরু হয়। পিতৃহীন অসহায় বালক মোতালেব আল্লাহ্‌র দরবারে বিগলিত চিত্তে শুধু দোয়া করেন। তাঁর দুলা ভাই আব্দুর রহমান ও চাচাতো ভাই আব্দুল হামিদ তাকে সান্তনা দেন। তারুয়া গ্রামের আহমদীরা তার প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। তাই তিনি সকল বিরোধিতাকে ঈমানের পরীক্ষা হিসেবে বরণ করে নেন এবং উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হন। একবার গ্রামের লোকজন তাকে আহমদী ছাড়ার জন্য তার বড় ভাইয়ের নিকট চাপ প্রয়োগ করে। মোতালেব সাহেবের ভাষায়–

"১৯৩৭ সালে আমাদের গ্রামের মুরুব্বীরা একজোট হয়ে আমার বড় ভাই আব্দুল আলী সাহেবের নিকট আসেন এবং বলেন, আপনি যদি আমাদেরকে চান তবে আপনার ভাইকে ত্যাগ করুন। আর যদি আপনার ভাইকে চান তবে আমাদেরকে ত্যাগ করুন। এ সময়ে আমার পিতা জীবিত ছিলেন না। আমার ভাই আমার অভিভাবক এবং আমাদের এলাকার সরদার। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাই তিনি আমাকে বললেন, 'এলাকার লোকজন আমাকে এসব কথা বলেছেন। কাজেই তুমি তওবা কর। কেননা তুমি আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞানী হওনি। এছাড়া তোমার বয়সও কম। যদি কাদিয়ানী ধর্মমত সত্য হয় তবে আমরাও গ্রহণ করবো। তখন তুমি গ্রহণ করতে পারবে'। উত্তরে আমি বললাম, যা সত্য ও ভালো বলে জেনেছি তা-ই আমি গ্রহণ করেছি। আর ধর্মের ব্যাপারে ছোট ও বড়র মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত দেন সে ছোট হলেও সত্য বুঝতে পারে এবং সত্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে। ইতিহাস তার সাক্ষী। যেমন হযরত আলী (রা.) বালক বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। একথা শুনে বড় ভাই রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন এবং আমাকে আহমদী ছাড়ার জন্য আরও বুঝাতে সচেষ্ট হন। অবশেষে আমি ভাইকে বলি–আপনি এলাকার লোকদের নিয়ে থাকুন এবং আমাকে ত্যাগ করুন। এ বলে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসি।" (পাক্ষিক আহমদ, ১৫ জুন ২০০৩)।

১৪-১৬ অক্টোবর ১৯৩৭ তারিখ বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ২১তম সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌলভী পাড়াস্থ মসজিদুল মাহ্‌দী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। খোদার রাহে ঘর ছাড়া মোতালেব ভাই আব্দুল হামিদের সাথে জলসায় গিয়ে উপস্থিত হন। সে সময় এ জলসায় কাদিয়ান থেকে মওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেবের শুভাগমন হয়েছিল। তিনি মোতালেব সাহেবের দুঃখের কথা শুনে তাকে অনেক আদর করেন, অভয়বাণী শুনান এবং তাঁর জন্য খাস দোয়া করেন। তাঁর ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন এবং ধর্মের জন্য তাঁর ত্যাগের কথা শুনে উপস্থিত বুযুর্গদের প্রাণ কেঁদে উঠে। সহমর্মিতা প্রকাশ করেন। তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণে অনেকে হাত বাড়ায়। সিলেটের স্কুল শিক্ষক সম্ভবত: আব্দুল মতিন সাহেব বলেন– 'তোমার কোন ভয় নেই। আজ থেকে আমি তোমার অভিভাবক। তুমি আমার বাড়ি চল। আমি তোমাকে লেখাপড়া শিক্ষায় মানুষ করবো'। সরাইলের মীর সিদ্দীক আলী তৎকালীন বাজিতপুর হাই স্কুলের শিক্ষক বলেন–'ছেলে মানুষ, সিলেটে এত দূরে যাবার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার সাথে বাজিতপুর চল। সেখানে লেখাপড়া করবে।' তখন সিলেটের মাষ্টার সাহেব একটি পোষ্টকার্ডে নিজের নাম ঠিকানা লিখে মোতালেব সাহেবের হাতে দেন এবং বলেন– 'তোমার কোন অসুবিধা হলে আমাকে এ ঠিকানায় জানাবে, আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।'

অতঃপর জলসার শেষে তিনি মীর সিদ্দীক আলীর সাথে সরাইল যান। তখন মীর সিদ্দীক আলীর পিতা মীর সেকান্দর আলী মোতালেব সাহেবকে দেখে করুণায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন– 'মোতালেব আমার বাড়িতে থেকে সরাইলে লেখাপড়া করবে। অন্য কোথাও যেতে হবে না'। তাই তার বাড়ির পাশের সরাইল অন্নদা হাই স্কুলে তাঁকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

মোতালেব সাহেব স্কুলে অধ্যয়নে অধ্যবশায় হয়ে লেখাপড়া করেন এবং মীর বাড়ির ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে পবিত্র কুরআন নাযেরা শিক্ষা ও জামাতী তালিম তরবিয়ত প্রদান করেন। প্রত্যহ বাড়ির সবাইকে নিয়ে বাজামাত নামায পড়ার ব্যবস্থা করা হয়। অপর দিকে বিভিন্ন জনের নিকট আহমদীয়া

জামা'তের সত্যতার ওপর তবলীগ করতে থাকেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনি ধার্মীক ও তাকওয়াপরায়ণ মানুষ হিসেবে সুপরিচিত হন। মীর সেকান্দর আলী ও তার স্ত্রী জোবেদা বেগম নিজ সন্তানের মত আদর করেন। তার সন্তানরা আপন ভাইয়ের মত জ্ঞান রাখেন। তিনি বাড়িতে মুন্সী হিসেবে পরিচিত হন। স্কুলে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ভালো মানুষ হিসেবে সকলের নিকট প্রশংসিত হন। পাড়ার মুরুব্বীদের নিকট স্নেহভাজন হয়ে উঠেন।

সে সময় চট্টগ্রামের সৈয়দ খাজা আহমদ সাহেবের বড় ছেলে সৈয়দ সোলাইমান আহমদ (খোকা) চট্টগ্রাম থেকে সরাইল এসে সরাইল অন্নদা হাই স্কুলে ভর্তি হন। তখন মোতালেব সাহেব তাকে জামা'তী তালিম তরবিয়তের শিক্ষা প্রদান করেন। খোকা সাহেব মোতালেব সাহেবের শিক্ষা ও স্নেহমমতা আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

মোতালেব সাহেব ইসলামী শিক্ষায় নামায ও রোযার সাথে মালী কুরবানী আবশ্যকতাও উপলব্ধি করতেন। নিজের কোন আয় উপার্জন না থাকলেও জামা'তের বিভিন্ন খাতে চাঁদা দিতেন। তিনি তাহরীকে জাদীদ খাতে ১৯৩৯-১৯৪০ সালে ৬ষ্ঠ বর্ষে বার আনা চাঁদা পরিশোধ করেছিলেন।

১৯৪০ সালে মীর সেকান্দর আলীর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর অনেক সেবা শুশ্রূষা করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ছেলেদেরকে ডেকে বলেন– 'আমি চাই আমার মৃত্যুর পর মোতালেবের ভরণপোষণ ও লেখাপড়ার দায়িত্ব তোমরা পালন করবে। এ ব্যাপারে তোমাদের মতামত কি বল?' উত্তরে সবাই বলেন, মোতালেব যতদিন থাকতে চায় আমরা তাঁর সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব পালন করবো। কিন্তু সে যদি নিজে চলে যেতে চায় সেজন্য আমরা দায়ী হবো না। ছেলেদের এ অভিব্যক্তি শুনে তিনি আশ্বস্ত হন।

মোতালেব সাহেব স্কুলে ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া গ্রামবাসীদেরও অনেক তবলীগ করেন। বিভিন্ন গ্রামের তার আত্মীয় স্বজনের বাড়ি গিয়ে তাদের সাথে আহমদীয়া জামা'তের সত্যতার ওপর আলোচনা করা হয়। ফলে তাঁর মা খাতেবুন্নেসা, ছোট ভাই মহসীন, এক খালা ও তাঁর ছেলে এবং এক নানা মওলানা আব্দুর রহমান আহমদী জামা'তে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এ মওলানা সাহেব আলেম ও ফাজেল পাশ একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন।

এ ছাড়া তবলীগ পাগল মোতালেব সাহেব খৃষ্টান ধর্মের প্রচারক পাদ্রীদের সাথেও বহাস করেছেন। পাদ্রীরা তাঁর সাথে ধর্মীয় আলোচনায় পরাভূত হয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যান। লবন যেমন পানিতে গলে যায়, আশেকে মসীহদের নিকট পাদ্রীদের মতবাদ গলে যায়।

মীর সাহেবের মৃত্যুর পর তার পাঁচ ছেলে ভিন্ন হয়। সবাই মোতালেব সাহেবকে নিজ পরিবারে নিতে চায়। কেননা সবারই তার প্রতি সমান আদর ছিল। তখন মোতালেব সাহেব ১৯৪৫ সালে মীর রফিক আলীর সাথে ময়মনসিংহ চলে যান। মীর রফিক আলী সাহেব তখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি সরাইল স্কুল থেকে ৭ম শ্রেণীর সার্টিফিকেট নিয়ে ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি হন। উচ্চ শিক্ষার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করতে মনোনিবেশ করেন।

সে কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জামা'তে দে-হাতী মোয়াল্লেম নিয়োগের তাহরীক করেন। মোতালেব সাহেব তাহরীক শুনে আবেদন প্রেরণ করেন। হুযূর (রা.) নিকট থেকে যথারীতি মঞ্জুরী আসে। তখন তিনি ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র। আত্মীয়-স্বজন কাদিয়ানে না গিয়ে লেখাপড়া করে বি এ পাশ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু কাদিয়ান পাগল মোতালেব সাহেবের মন প্রাণ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় ব্যকুল হয়ে যায়। এ টানাপোড়নের মাঝে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশনা লাভের জন্য ইশতেখারা করেন। স্বপ্নে দেখেন–মওলানা এ এইচ এম আলী আনোয়ার সাহেব তাঁকে আঙ্গুল দিয়ে কাদিয়ানের দিকে ইঙ্গিত করছেন। অতঃপর তিনি সকল বাধা উপেক্ষা করে কাদিয়ান যেতে প্রস্তুতি নেন। মায়ের নিকট থেকে বিধায় নিতে যান। মা বুকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদেন। মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে। বার বার বলেন, 'তোমার সাথে আমার হয়তো আর দেখা হবে না। এটাই শেষ দেখা। তোমার জন্য আমার বুকভরা দোয়া রইল'। তিনি মায়ের জন্য দোয়া করে আল্লাহ্‌র নামে বের হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার দূরে অচেনা গ্রাম কাদিয়ানে ১৭ মার্চ ১৯৪৭ তারিখ পৌঁছেন। পবিত্র ভূমি কাদিয়ানে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং জামা'তের বিশিষ্ট সাহাবী ও বুযুর্গ আলেমদের সাথে সাক্ষাতে তাদের দোয়া ও স্নেহস্পর্শ লাভ করেন। তিনি মাদ্রাসায় দে-হাতী মোয়াল্লেম কোর্সে ভর্তি হন।

১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ তারিখ ভারত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পর পাঞ্জাবে মুসলমানদের ওপর শিখ ও হিন্দুদের নির্যাতন শুরু হয়। তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কাদিয়ানে জামা'তের সম্পদ রক্ষার উদ্দেশ্যে দরবেশ নিযুক্তির তাহরীক করেন। হুযূর (রা.) নির্দেশ ছিল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্র ব্যতীত অন্যদেরকে দরবেশ হিসেবে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু কাদিয়ান পাগল মোতালেব সাহেবের মন-প্রাণ দরবেশী জীবন লাভের প্রত্যাশায় অধীর হয়ে যায়। তাই তিনি নিজের আকুতি ব্যক্ত করে আবেদন করেন। হুযূর (রা.) বিশেষ বিবেচনায় এটা মঞ্জুর করেন। ফলে তিনি মাদ্রাসা থেকে ছুটি নিয়ে দরবেশে কাদিয়ানের দায়িত্ব পালনে ব্রত হন। ৩১৩ জন দরবেশের মধ্যে তাঁর ক্রমিক নম্বর ৩৮। তিনি কাদিয়ানে জামা'তের সম্পদ রক্ষায় অন্যান্যদের সাথে জীবন বাজী রেখে কাজ করেছেন। ফলে জামা'তের খেদমতে তার ত্যাগ ও কুরবানী ইতিহাস সৃষ্টি করে।

পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিবেশ শান্ত হওয়ার পর তৎকালীন নাযেরা আলা হযরত মির্যা ওয়াসিম আহমদ (রাহে.)-এর নির্দেশে মোতালেব সাহেব ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম বঙ্গের কলকাতা যান। পশ্চিম বঙ্গের মিশনারী ইনচার্জ মওলানা মোহাম্মদ সেলিম সাহেবের নির্দেশানুসারে মুর্শিদাবাদ জেলার ইব্রাহীমপুর জামা'তে সর্ব প্রথম কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত: মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন গ্রামে অনেক তবলীগ করেন। পুরাতন আহমদীদেরকে জামা'তী তালিম তরবিয়ত প্রদানে চাঙ্গা করে তোলেন। ভরতপুর থানার অধীন তালগ্রাম, রাইগ্রাম, পিনখুন্ডী, ওয়াইথা, সুন্দরপুর, কয়থা, পুলিয়া, ভগবানগোলা, আরমারী এবং হড়হড়ি প্রভৃতি স্থানে জামা'ত প্রতিষ্ঠায় তিনি অবদান রাখেন। আসামের ক'টি স্থানেও তাঁর প্রচেষ্টায় জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐশী আলোর ব্যাখ্যায় প্রদত্ত তাঁর তবলীগি আলোচনায় মানুষ মোহীত হতেন। বড় বড় ডিগ্রীধারী আলেমরা যুক্তিতর্কে পরাভূত হয়। অনেক স্থানে বহাসে মোখালেফাতে মারমুখী

অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐশী নিদর্শন লাভে রক্ষা পান।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ২৯ নভেম্বর ১৯৩৫ তারিখ জুমুআর খুতবায় বলেন, 'আমি এরূপ ব্যক্তি চাই যারা নিজে পাগল এবং অপরকে পাগল করে তোলে'। প্রকৃতপক্ষে মোতালেব সাহেব খিলাফতের ডাকে সেরূপ আত্মহারা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দিনরাত নিরলসভাবে তবলীগ করেছেন। খোদার রাহে এক ফেরিওয়ালায় পরিণত হয়েছিলেন।

জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট বুযুর্গ মোতালেব সাহেব সত্য স্বপ্ন ও কাশফ দেখতেন। দোয়া কবুলিয়তের অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর ঘটেছে। অনেক ঐশী নিদর্শন ও মোজেযা তাঁর জীবনে পরিস্ফুটিত হয়। নিম্নে ক'টি আলোচনা করা হল :-

(১) ১৯৪৭ সালে কাদিয়ান যাবার সাত মাস পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তিনি সংবাদটি মৃত্যুর দিনেই অলৌকিকভাবে খোদার তরফ থেকে অবগত হন। গায়েবে জানাযা পড়ার জন্য এলান করেন। তখন দরবেশগণকে নিয়ে গায়েবে জানাযা নামায আদায় করা হয়। পরে বিষয়টি তিনি পত্রের মাধ্যমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছোট ভাই মহসীনকে জানান। বাড়িতে এ সংবাদটি শুনে সবাই বিস্মিত হন। যেদিন মায়ের মৃত্যু হয় এবং তার জানাযা নামায পড়ে কাফন-দাফন করা হয়েছে, সে দিনই তিনি কিভাবে অবগত হলেন। কেননা তখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কাদিয়ানের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নেক বান্দাদেরকে নেক কাজে এমনই ভাবে নিদর্শন প্রদর্শন করে থাকেন।

(২) তিনি একবার তবলীগি সফরে আসামের কামরুহ কমাইখ্‌খা যান। এক সুহৃদ ব্যক্তিকে তবলীগ করে তাঁর বাড়িতে একটি তবলীগি সভার আয়োজন করা হয়। অনেক লোক উপস্থিত হন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের সত্যতা আলোকপাত করতে থাকেন। এমন সময় একদল বিরুদ্ধবাদী সভায় আক্রমণ করে। তাঁকে মেরে ফেলার জন্য উদ্বুদ্ধ হন। অবস্থা বেগতিক দেখে বাড়ির মালিক তাকে বাড়ির ভিতর একটি ঘরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। বিরুদ্ধবাদীরা সেই ঘরে আক্রমণ করে। তাঁকে বের করে দিতে চাপ প্রয়োগ করে। তখন বাড়ির মালিক বলেন– 'তিনি এখন রাতে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আমি তাকে মেরে ফেলার জন্য আপনাদের হাতে তোলে দিতে পারি না। আগামীকাল সকালে বের করে দিবো।' তখন বিরুদ্ধবাদীরা রাতে বাড়ি পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

এমতাবস্থায় বাড়ির মালিক মোতালেব সাহেবকে বলেন– 'বাড়ির তিন দিকে তারা পাহারা দিচ্ছে। অপর দিকে জঙ্গল। সুতরাং রাতে আপনার পালানোর পথ নেই। শুধুমাত্র বাড়ির পিছনের জঙ্গল কেটে বের হতে পারেন'। তখন আশেকানে রাহে মাওলা– খোদার পথে বন্দী মোতালেব সাহেব বাড়ির মালিক থেকে একটি দা নিয়ে জঙ্গল কেটে কেটে সামনের দিকে অগ্রসর হন। কিছু দূর যাবার পর একটি রাস্তা দেখতে পান। সেখানে একটি সাদা রঙের ঘোড়া দাঁড়ানো আছে। পিছন থেকে কে যেন বলছে মোতালেব ঘোড়ায় চড়। কিন্তু তিনি ইতিপূর্বে কখনও ঘোড়ায় চড়েননি। তবুও ঐশী নির্দেশে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোড়ায় চড়েন। ঘোড়াটি অনেক দূর গিয়ে একটি জনবহুল রাস্তার পাশে থামেন। সেখানে নেমে তিনি একটি ট্রাকে উঠে কামরুহ কামাইখ্‌খা এলাকা নিরাপদে পাড় হন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন।

(৩) ১৯৫৫ সালে মোতালেব সাহেব মুর্শিদাবাদ এলাকার বাজিতপুর গ্রামে মাষ্টার মোহাম্মদ শামসুদ্দিন দানী সাহেবের সাথে এক তবলীগি সফরে যান। পাঁচ/ছয় হাজার লোকের উপস্থিতিতে এক বহাসের আয়োজন করা হয়। বহাসে যুক্তি তর্কে বিরুদ্ধবাদী মৌলভী কারী নেয়ামত উল্লাহ্ পরাভূত হয়ে ভীষণ রেগে যান। তখন কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা পয়গাম পত্রিকার একটি কপি একজন নিয়ে এসে মৌলভী সাহেবের এক সহকারীকে দেন। এতে লেখা আছে পাকিস্তানী মৌলভীদের ফতোয়া কাদিয়ানী কতল করতে পারলে শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা পড়ে মৌলভী সাহেবের নিকট মতামত চাইলে তিনি একমত প্রকাশ করেন। তখন তারা আহমদী দু'জনকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে মারতে শুরু করে। এরই মাঝে তাদের ক'জন এসে তাঁরা দু'জনকে নিরাপদ হেফাজতে নিয়ে যান। সেদিন আশেকে মসীহ্ দু'জন হয়তো হাজার লোকের শারীরিক নির্যাতনে মারা যেতেন। কিন্তু আল্লাহ্ রক্ষা করেন।

(৪) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) অনেক স্নেহস্পর্শ ও ভালোবাসা অর্জন করেছিলেন মোতালেব সাহেব। এ প্রসঙ্গে তাঁর সুযোগ্য সন্তান মওলানা সুলতান সালাহ উদ্দিন কবীর, শিক্ষক, জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন কাদিয়ান বলেন– আমার বড় ভাই আব্দুল্লাহ্ জালাল উদ্দিনের ছেলে মোবারক আহমদের বিয়ে উপলক্ষে খুতবা নিকাহ প্রদানের সময় প্রসঙ্গক্রমে মোহতরম হাকীম মোহাম্মদ দীন সাহেব, সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন– একবার কাদিয়ান থেকে আমরা ক'জনের একটি প্রতিনিধি দল রাবওয়ায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) সাথে সাক্ষাৎ করতে যাই। তখন হুযূর (রা.) শারীরিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। আমাদেরকে বলা হয়, হুযূরের সাথে সাক্ষাতে বেশি কথা বলা যাবে না। শুধু দেখা করে ও দোয়া চেয়ে চলে আসবেন। অতঃপর আমরা হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ ও দোয়া চাইতে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করি। তখন হুযূর (রা.) দরবেশ মোতালেব সাহেবকে দেখেই হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বলেন–'এই যে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর যুগের বুযুর্গ এসেছেন'। যুগ খলীফার এ উক্তি তাঁর জীবনের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি।

(৫) পশ্চিম বঙ্গ ও আসামের সাবেক ন্যাশনাল আমীর মাশরেক আলী সাহেব বলেন– একবার মোতালেব সাহেবের সাথে আমি এক তবলীগি সফরে মুর্শিদাবাদের ধুনিয়া গ্রামে যাই। আমাদের পরিচিত এক লোকের বাড়িতে গিয়ে দেখি তিনি বাড়ি নেই। রাত হয়ে যায়। অন্ধকার রাতে আমাদের ফেরার কোন ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণ অপরিচিত জায়গায় কোথায় কিভাবে রাত কাটাবো এবং কি খাবো চিন্তায় পরে গেলাম। কিন্তু মোতালেব সাহেবের খোদার ওপর পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি দোয়া করেন। এক অপরিচিত ব্যক্তির ঘরে অনুমতি নিয়ে আমরা নামায আদায় করি। আমাদের অবস্থা দেখে সে ব্যক্তিটি বললেন– 'আপনাদের দুঃশ্চিন্তার কিছুই নেই। আজ আপনারা আমার মেহমান।' তিনি একটি হাস জবাই করে রাতে খাবার ও থাকার সুব্যবস্থা করেন। তাঁর দোয়ার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা সমস্যার সমাধান করে দেন।

(৬) ১৯৬৩ সালে মোতালেব সাহেব-এর ছোট ভাই মোহাম্মদ মহসীন সাহেব ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তিনি বলেন– হায়! আমার ভাই মোতালেব যদি আমাকে দেখতে আসতেন এবং আমার জন্য দোয়া করতেন আমি সুস্থ হয়ে যেতাম। একথা শুনে মহসীন

সাহেবের স্ত্রী বলেন– 'তিনি মুর্শিদাবাদে জামা'তের কাজে আছেন। তোমার অসুস্থতার খবর জানেন না। সুতরাং তিনি কি করে আসবেন।' কিন্তু পর দিন মোতালেব সাহেব বাড়ি এসে হাজির। তিনি বলেন– আমি স্বপ্নে দেখেছি একটি বাঘের সাথে যুদ্ধ করে বাঘটিকে পরাভূত করেছি। তখন আমার উপলব্ধি হয় বাড়িতে কোন সমস্যা হয়েছে। তাই চলে এলাম। অতঃপর তিনি ভাইয়ের জন্য দোয়া করেন এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান।

(৭) মোহতরম আতাউর রহমান সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট নেপাল বলেন– আমি আহমদীয়াতের সত্যতানুসন্ধানে ১৯৮৫ সালে প্রথম কাদিয়ানে যাই। তখন দরবেশ মোতালেব সাহেবের সাথে প্রথম পরিচয়েই আমি মুগ্ধ হই। তাঁর নিকট থেকে পিতৃতুল্য ভালোবাসা ও স্নেহ মমতা পেয়েছি। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও সহানুভূতিশীল এবং পরহেজগার মানুষ ছিলেন। কাদিয়ানে এক বছর অবস্থানকালে আমার মনে হয়েছে আমি আমার পিতার স্নেহে নিজ দেশ নেপালেই আছি।

(৮) মওলানা সুলতান সালাহ উদ্দিন কবীর বলেন– আমার পিতা অত্যন্ত সাদাসিধে নেক ও পবিত্র চিত্তের মানুষ ছিলেন। সারা জীবন দরবেশী জীবন যাপন করেছেন। তিনি নিজের কাপড় নিজে তালি দিয়ে পরিধান করতেন। দরিদ্রতার মাঝে অতি দুঃখকষ্টে এবং বিপদাবলীর সময় কখনও বিচলিত হননি। সর্বদা তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা– তোমরা শিথিল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, যদি তোমরা মু'মিন হও তবে তোমরাই প্রবল থাকবে (আলে ইমরান ঃ ১৪০) মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন তিনি। তাঁর স্বপ্নের তাবির অধিকাংশ সময় সঠিক হত। তাহাজ্জুদ নামাযে বিগলিত চিত্তে দোয়া করা তার জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি খোদার সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলেছিলেন।

(৯) মোতালেব সাহেব জামা'তের কাজে কাদিয়ানসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত থাকলেও জন্মভূমির সাথে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক ছিল। তাই আত্মীয়-স্বজন কে কেমন আছেন জানার জন্য পত্র লিখতেন। সময় সুযোগে ছুটি নিয়ে নাড়ীর টানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া চলে যেতেন। সবার জন্য মন ভরে দোয়া করতেন। সেজন্য তাঁর আত্মীয়রা তাঁর দোয়ার কাঙ্গাল ছিলেন। যে কোন সমস্যা হলে তাঁর নিকট দোয়ার আরজ করতেন। উপরন্তু আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখার জন্য তিনি তাঁর ছেলে আব্দুর রহমানের সাথে ছোট ভাই মহসীন সাহেবের মেয়ে কহিনুর বেগমের বিয়ে ব্যবস্থা করেন। এ আদর্শগত শিক্ষায় তাঁর সন্তানরাও বাংলাদেশে বিবাহ শাদী অব্যাহত রেখেছেন।

মোতালেব সাহেব ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভরতপুরের ইব্রাহীমপুর জামা'তের ইয়াকুব হোসেন সাহেবের মেয়ে সাবেরা খাতুনকে বিয়ে করেন। বিবাহ পড়ান মওলানা মোহাম্মদ সেলিম সাহেব। এ বিয়ে তাঁর একটি সত্য স্বপ্নের বাস্তবায়ন ছিল। তাঁর সহধর্মিণী খুবই পরহেজগার ও নেক মহিলা। তিনি জামা'তের কাজে স্বামীকে সর্বদা উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন। বর্তমানে পঁচাশি বছর বয়সে কাদিয়ানে ছেলের সাথে বসবাস করেন। দরবেশের এ নেক পরিবারে ছয়টি ছেলের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন–

১. জনাব আব্দুল্লাহ্ জালাল উদ্দিন, ২. জনাব আব্দুর রহমান নাসিম, ৩. জনাব আব্দুল বাসেত, ৪. মওলানা সাফির আহমদ শামীম, ৫. মওলানা সুলতান সালাহ উদ্দিন কবীর এবং ৬. জনাব মোহাম্মদ আবেদ।

ছেলের মধ্যে আব্দুল্লাহ্ জালাল উদ্দিন সাহেব জামা'তের মোয়াল্লেম ছিলেন। বর্তমানে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণে আছেন। আব্দুর রহমান নাসিম কারকুন বায়তুল মাল আমদ হিসেবে জামা'তে কর্মরত আছেন। আব্দুল বাসেত কাদিয়ানের লঙ্গরখানার বাবুর্চী হিসেবে কর্মরত। মওলানা সফির আহমদ শামীম ও মওলানা সুলতান সালাহ উদ্দিন কবীর মুরুব্বী সিলসিলাহ। মোহাম্মদ আবেদ সাত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সন্তানরা পিতার মত গুণী এবং জামা'তের কাজে ফানাফিল্লাহ্। ফলে মোতালেব সাহেব অভিভাবক হিসেবে সার্থক ও সফল ব্যক্তি।

খোদার দরবেশ মোতালেব সাহেব দরবেশী জীবন যাপনে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের পরও জামা'তী কাজে নিবেদিত ছিলেন। ইহজীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথার্থভাবে সম্পাদন করেন। পরিশেষে খোদা তা'লার সান্নিধ্যে অনন্ত জীবনে পাড়ি দেয়ার সময় ঘনিয়ে আসলে চল্লিশ দিন পূর্বে পক্ষাঘাতে অসুস্থ হন। তিনি তাঁর মৃত্যুর সময় উপলব্ধি করতেন। তাই মৃত্যুর পূর্বে অনেকগুলি খামের ওপর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের ঠিকানা লিখে রাখেন। যেন তাঁর মৃত্যুর পর সংবাদটি ঠিকানা অনুযায়ী জানানো সুবিধা হয়। মৃত্যুর পূর্ব দিন তিনি কাদিয়ানের তাঁর বন্ধু-বান্ধব এবং জামা'তের অনেক সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সবার সাথে প্রাণ খোলে কথা বলে বিধায় নেন। রাতে তাঁর সামান্য কষ্ট হয় এবং ভোররাতে তাহাজ্জুদ নামাযের সময় নিজ প্রাণ খোদার নিকট সোপর্দ করে দেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখটি ১ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সাল। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬২ বছর। তিনি ওসীয়্যতকারী ছিলেন। ওসীয়্যত নং ৮০৪৭। কাদিয়ানের পুণ্যভূমি বেহেশ্‌তী মাকবেরায় দাফন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মোকাম দান করুন, আমীন।

(চলবে)

লেখা আহ্বান

আগামী বছর ২০১৫ সালে মজলিস আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার পচাত্তর বছর পূর্ণ হবে। তাই পচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ কর্তৃক একটি মনোরম স্মরণীকা প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্। সেজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তালিম তরবীয়ত এবং ইতিহাস ভিত্তিক যে কোন লেখা প্রদানের জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে। আনসার, খোদ্দাম, আতফাল ও লাজনা, নবীন-প্রবীন লেখক সকলেই লেখা দিতে পারেন। লেখা আগামী ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখের মধ্যে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল
আহ্বায়ক, সুভিনর কমিটি
মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ
৪, বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১

গিবত
একটি জঘন্য পাপ

মওলানা নাবিদ আহমদ লিমন
মুরব্বী সিলসিলাহ

(৪র্থ কিস্তি)

ইসলাম গিবত করা থেকে শুধু নিষেধই করেনি বরং এটি যে জঘন্য পাপ সে সম্পর্কেও অবিহিত করা হয়েছে। গিবত সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) কুরআন শরীফের আয়াতের আলোকে বলেছেন, হে ঈমান আনয়নকারীগণ! কোন জাতি যেন কোন জাতিকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ না করে। যাকে নিয়ে তোমরা হাসি তামাশা বা কৌতুক করছ এবং যাকে তোমরা ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্র বানাচ্ছো হতে পারে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম। আর না কোন মহিলার উচিত কোন মহিলাকে নিয়ে হাসি তামাশা করা। যে মহিলা অন্য মহিলাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করছে হতে পারে সে তার চেয়ে উত্তম। নিজেদের লোকদের তোমরা খোঁটা দিওনা আর কারো সম্পর্কেই খারাপ উপাধি ব্যবহার করো না। এরূপ কৃতকর্মের দরুন মন্দ উপাধি দানকারী আল্লাহ্ তা'লার নিকট ফাসেক ও ব্যভিচারী উপাধি পেয়ে থাকে আর মু'মিন হিসেবে পরিচয় দেয়ার পর ফাসেক হওয়া অত্যন্ত খারাপ। আর যে সকল লোকেরা মন্দ কাজ থেকে বিরত হয় না তারাই পাপাচারী। (তাসদীক বারাহীনে আহমদীয়া পৃষ্ঠা-২৭৩)।

মু'মিন হওয়ার পর নিজের নাম ফাসেক রাখা খুবই মন্দ কথা। এই ঠাট্টা বিদ্রূপ কিভাবে সৃষ্টি হয়? ঠাট্টা বিদ্রূপ সৃষ্টির মূলে হলো মন্দ ধারণা। মন্দ ধারণা থেকেই সব ধরণের ঠাট্টা বিদ্রূপ সৃষ্টি হতে থাকে। এ কারণেই বলা হয়েছে, ***'ইজতানিবু কাসিরান মিনায যান্নে'*** (সূরা হুজুরাত: ১৩) অর্থাৎ তোমরা বার বার সন্দেহ করা থেকে বিরত থাক।

হাদীস শরীফে এসেছে মহানবী (সা.) বলেছেন 'ইয়্যাকুম ওয়ায যান্না আকযাবুল হাদীসে' অর্থাৎ এই মন্দ ধারণা থেকে অনেক বড় ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে। কারো সম্পর্কে আমরা যখন মন্দ কোন ধারণা করবো তখন কিন্তু আমি নিজেই আমার ক্ষতি করছি। তাই আমার কি এমন প্রয়োজন যে নিজের ক্ষতি নিজের দ্বারাই করবো? এজন্য আমাদেরকে সব সময় অন্য কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা না করে সুধারণা পোষণ করতে হবে। আমার মন যদি সব সময় সুধারণার বাহক হয় তাহলে আত্মা যেমন শান্তিময় থাকবে তেমনি মনমানসিকতাও হবে অন্যদের তুলনায় অনেক উচ্চ মার্গের।

খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ সম্পর্কে এক স্থানে উল্লেখ করেন– আমি একটি বই আনিয়েছিলাম যা অতুলনীয় ছিল। আমি কোন এক সভায় বইটির খুবই প্রশংসা করলাম আর কিছুদিন পরেই সেই বইটি হারিয়ে গেল। কোন বিশেষ ব্যক্তির ওপর আমার সন্দেহ ছিল না কিন্তু আমার মনে এই ধারণা অবশ্যই ছিল যে, কেউ এটি চুরি করেছে। একদিন যখন আমি আমার ঘর থেকে আলমারী সরালাম তখন দেখি যে আলমারীর পিছনে অনেক বই পরে রয়েছে। এ থেকে আমি বুঝলাম, যে বই আমি রেখেছিলাম আর তা পিছনে পরে গিয়েছিল। সেই সময় আমার নিকট তত্ত্বজ্ঞানের দু'টি দিক স্পষ্ট হলো। প্রথমত আমি নিজেকেই ভর্ৎসনা দেই যে, আমি কেন অন্যের ওপর মন্দ ধারণা পোষণ করলাম। দ্বিতীয়ত খোদা তা'লার পুস্তক যা আমার কাছে বিদ্যমান ছিল তা এই পুস্তকের চেয়ে অধিক প্রিয় ও উত্তম হওয়া সত্ত্বেও আমি কেন এই পুস্তকের জন্য কষ্ট পেলাম।

এরপর খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরেক স্থানে এমনই আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করেন– আমাকে কেউ একজন একটি খুব সুন্দর টুপি পাঠিয়েছিলেন যাতে হাতের কারুকাজ করা ছিল। একজন অপরিচিত মহিলা আমাদের ঘরেই ছিল। টুপির এই কারুকাজের প্রতি সেই মহিলার খুবই আগ্রহ ছিল আর সেই মহিলা অত্যন্ত আগ্রহ ভরে সেই টুপির কাজ দেখছিল। কিছুক্ষণ পরে সেই টুপি হারিয়ে গেল। এই টুপি হারানোর কারণে আমার কোন কষ্ট ছিল না, কেননা এই টুপি না আমার মাথায় আসত আর না আমার সন্তানের মাথায়। কিন্তু আমার দৃষ্টি সেই মহিলার দিকে গেল যে, সেই মহিলার হয়ত টুপিটি ভাল লেগেছে। সেই মহিলা চলে যাওয়ার অনেক দিন পরে যখন বিছানা পরিষ্কার করার জন্য বিছানা খোলা হল তখন বিছানার তলদেশ থেকে সেই টুপিটি বেরিয়ে আসল।

খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেন, দেখুন মন্দ ধারণা কতটা ভয়ানক, আল্লাহ্ তা'লা তার কতক বান্দাকে শিখিয়ে থাকে। যেমন তিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে পথ দেখিয়েছেন। অন্যান্য লোকদের দ্বারাও এমন কাজ হয়ে থাকে। কিন্তু তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর না। এই মন্দ ধারণার মূল থেকেই খামাখা গোয়েন্দাগিরি ও অন্বেষণ। এ কারণেই বলা হয়েছে 'ওয়ালা তাজাসসাসু' অর্থাৎ তোমরা কারো ওপর গোয়েন্দাগিরি করো না। পরিশেষে গোয়েন্দাগিরি থেকে গিবতের ব্যধি সৃষ্টি হয়।

খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ স্থানে দু'টি ঘটনা এ কারণেই উল্লেখ করেন যে, কারো কারো ওপর কখনও কখনও মন্দ ধারণা ও অন্যায় সন্দেহ করা হয়ে থাকে। কিন্তু যাদের সম্পর্কে ধারণা করা হয়েছে তাদের দ্বারা এরূপ কাজ হয়নি। পরবর্তীতে এই মন্দ ধারণা থেকেই গিবতের সৃষ্টি হয়। হাদীস শরীফে এসেছে যে, এক মহিলাকে প্রহার করা হচ্ছিল এবং বলা হচ্ছিল যে তুমি ব্যভিচার করেছো, তুমি চুরি করেছো। অপর মহিলা এটি শোনার পর তার ওপর প্রভাব পড়ল এবং সে দোয়া করল, হে খোদা! আমার সন্তানাদি যেন এমন না হয়। তার কোল থেকে ছেলে বলে উঠল যে হে খোদা আমাকে এমনই বানিও। কেননা এই মহিলার ওপর অন্যায় সন্দেহ করা হচ্ছে। এই ঘটনায় অনেক ভাল দিক রয়েছে। ঠিক তদ্রূপ আরো বর্ণিত রয়েছে যে, মা দোয়া করল যে, হে খাদা! আমার সন্তান যেন এমনই হয় তখন সন্তান বলল, হে খোদা! আমি যেন এমন না হই। অতএব কারো প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অন্যের কিভাবে প্রকৃত ধারণা হতে পারে। প্রত্যেকের সব বিষয়াদি খোদা তা'লার সাথে সম্পৃক্ত। হতে পারে এক ব্যক্তি সে রকম না কিন্তু তাকে সেরকম মনে করা হচ্ছে। লোকদের দৃষ্টিতে সে তুচ্ছ, কিন্তু সে খোদা তা'লার নৈকট্যপ্রাপ্ত বা খোদার বন্ধু।

পুনরায় বলেন– 'ওয়ালা নিসাউম মিন নিসাইন' (সূরা হুজুরাত: ১২) অর্থাৎ আর নারীরাও অন্য কোন নারীদের উপহাস করবে না। এখানে মহিলারা বসা অবস্থায় নেই কিন্তু পুরুষের আত্মাও স্ত্রীবাচক আর প্রত্যেকেই এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের ঘরে এই সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, কোন মহিলা যেন অন্য কোন মহিলাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে এবং হাসি তামাশা না করে। তোমরা একে অন্যের ওপর দোষক্রটি লাগিও না এবং মন্দ নাম রাখিও না। যদি তুমি কারো মন্দ নাম রাখো তাহলে তোমার নাম পূর্বেই ফাসেক হয়েছে। আমি তোমাদের নসীহত করছি যে তোমরা নিজ নিজ কৃতকর্মের পর্যালোচনা কর এবং মন্দ বিষয় সমূহকে শুরুতেই পরিত্যাগ কর। (হাকায়েকুল ফুরকান, চতুর্থ খন্ড, পৃ: ২-৪, বদর ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ইং পৃ: ২)

একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) রমযান মাসে দরস দিতে গিয়ে বলেন– রোযা রাখা অবস্থায় গিবতকারী মৃত ভাইয়ের মাংসের কাবাব খেয়ে থাকে। সূরা আল হুজুরাত এর ১৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। তোমরা গোয়েন্দাগিরী করো না, গোয়েন্দাগিরীর অভ্যাস মন্দ ধারণা থেকে সৃষ্টি হয়। যখন মানুষ কারো সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করার কারণে তার ওপর একটি খারাপ মন্তব্য পোষণ করে নেয়, তখন সে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে যে যেভাবেই হোক তার যেন কোন না কোন দোষ ক্রটি পেয়ে যাই। তখন সে ছিদ্রান্বেষণ শুরু করে দেয় আর এটি অনুসন্ধানেই সে নিজেকে নিমজ্জিত রাখে। সে এটি মনে করে যে, তার সম্পর্কে আমি যে ধারণা করেছি যদি কেউ আমাকে তা জিজ্ঞাসা করে তাহলে এর উত্তর কি দিব। সে তার মন্দ ধারণাকে পূর্ণ করার জন্য গোয়েন্দাগিরী করে, পরিশেষে এই গোয়েন্দাগিরী থেকেই গিবত সৃষ্টি হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে বলেছেন– ***'ওয়ালা ইয়াগতাব বা'যুকুম বাযা'*** (সূরা হুজুরাত: ১৩) অর্থাৎ এবং একে অন্যের গিবত (কুৎসা) করো না।

অতএব খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখো, মন্দ ধারণা থেকে অনুসন্ধান, আর অনুসন্ধান থেকে গিবতের অভ্যাস সৃষ্টি হয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন যেহেতু আজকাল রমযানের মাস অতিবাহিত হচ্ছে আর তোমাদের মধ্যে অধিকাংশই রোযাদার (অক্টোবর, ১৯০৭ইং সনের দরস দেওয়ার সময়ের ঘটনা) এ কারণে এই কথা আমি রোযা সম্পর্কে বলেছি যে, এক ব্যক্তি রোযাও রাখে আবার গিবতও করে থাকে, গোয়েন্দাগিরি এবং সমালোচনায় ব্যস্ত থাকে। তাহলে সে তার নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন– "আইউহিব্বু আহাদুকুম আইয়্যাকুলা লাহমা আখিহে মায়তান ফা কারিহতুমুহু" (সূরা হুজুরাত: ১৩) অর্থাৎ তোমাদের কেউ কি নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা এটা ঘৃণা করবে।

এখন বলুন, যারা গিবত করে তারা কিভাবে রোযাদার হতে পারে, তারা তো মাংসের কাবাব খাচ্ছে আর এ কাবাবও তার নিজ মৃত ভাইয়ের মাংসের। আর এটি একেবারেই সত্য কথা যে, গিবতকারী প্রকৃত অর্থেই এমন মন্দ ব্যক্তি হয়ে থাকে, যে তার নিজ মৃত ভাইয়ের কাবাব খেয়ে থাকে কিন্তু এই কাবাব প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পায় না। বর্ণনায় পাওয়া যায়, একজন সূফী ব্যক্তি কাশফী অবস্থায় দেখলেন যে, কোন এক ব্যক্তি কারো গিবত করল তখন তাকে বমি করানো হলো আর তার ভিতর থেকে মাংসের টুকরাও বেরিয়ে এলো যার থেকে দুর্গন্ধ আসছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আরো বলেন, স্মরণ রাখো! এগুলো কোন গল্প গুজব নয়, এগুলো এমন ঘটনা, যে সকল লোকেরা মন্দ ধারণা বা অন্যায় সন্দেহ পোষণ করে তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজের সম্পর্কে মন্দ ধারণা অন্যকে করতে শুনবে। এ কারণে আমি তোমাদের নসীহত করছি এবং আন্তরিকতার সাথে বলছি যে, তোমরা গিবত পরিত্যাগ কর। যারা অন্যের সমালোচনা, ছিদ্রান্বেষণ ও গিবত করে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পছন্দ করেন না। অসৎসঙ্গ পরিপূর্ণরূপে পরিহার কর, মন্দ ধারণার নিকটেও যেও না, মন্দ ধারণা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা এ থেকে গোয়েন্দাগিরীর আকাঙ্খা সৃষ্টি হবে আর পরিণামে গোয়েন্দগিরী থেকে গিবত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এটি একটি মন্দ চরিত্র আর মৃত খাবার সমতুল্য।

(আল হাকাম, ৩১ অক্টোবর, ১৯০৭ইং পৃ: ৮-৯, হাকায়েকুল ফুরকান, চতুর্থ খন্ড, পৃ: ৬-৭)

এ পর্বে আমরা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর গিবত সম্পর্কে কিছু মূল্যবান নসীহত তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, ইনশাআল্লাহ আগামী পর্বে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর গিবত সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনামূলক নসীহত তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আমাদের সবার কর্তব্য হলো প্রথমে নিজে গিবত করা থেকে বিরত থাকা তারপর অন্যকে এর কুফল সম্পর্কে বুঝানো এবং এর ওপর আমল করা। আল্লাহ্পাক আমাদের সবাইকে গিবত করা থেকে রক্ষা করুন।

(চলবে)

নবীনদের পাতা-

হিন্দুধর্মে কলিযুগ

মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ
নওবেকী, সাতক্ষীরা

কলিযুগে হিন্দুধর্মে দৃষ্কৃতির দমন ও সাধুগণের পরিত্রাণ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, "হে মানব জাতি তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র সত্তা অর্থাৎ আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা নিসা)

এখানে আল্লাহ্ বলেছেন, হযরত আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে পদচারণা থেকে মানব জাতির উদ্ভব এবং আল্লাহ্ মানব জাতির প্রভু প্রতিপালক। আল্লাহ্ শুধুমাত্র কোন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান বা ইহুদীদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক নন, তিনি মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু-প্রতিপালক, পরমেশ্বর আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়। বেদের ভাষ্য–তিনি এক মেবাদ্বিতীয়ম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ তিনি একমাত্র উপাস্য। (আল কুরআন) তিনি সর্বশক্তিমান এবং নিরাকার যেমন আলো, বাতাস নিরাকার। আল্লাহ্ আসমান এবং জমিনের আলো। (সূরা নূর) অর্থাৎ প্রার্থনার সময় আল্লাহ্‌কে নিরাকার মনে করে তাঁর দিকে একনিষ্ঠভাবে ধ্যান করতে হবে। কিন্তু যদি সাকার কল্পনা করা হয়, যেমন লক্ষ্মী, স্বরসতি, কালি তবে তো নিরাকারের আরাধনা হলো না। "নতস্য প্রতিমা আস্থি" প্রতিমার সাথে তার কোন তুলনা নেই। (উপনিষদ, যর্জুবেদ ৩২) তিনি জ্যোতির ও জ্যোতি সকল জ্যোতি বা আলো আল্লাহ্‌র আলোয় আলোকিত। জ্যোতিষ্যমপি তজ্জোতিস্ত। (উপনিষদ)

তিনি এক অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি জাতও নহেন এবং তার কোন জাতকও নেই। পূবর্তী এশি গ্রন্থের সার শিক্ষা আল কুরআনে রয়েছে, যেমন ঃ কুলহু আল্লাহু আহাদ, আল্লাহু সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ। বল, আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, স্বয়ম্ভু। তিনি জাতও নহেন তার কোন জাতকও নেই এবং তাঁর সমকক্ষ কেহ নেই। (আল কুরআন)

এই আল্লাহ্ সকলের স্রষ্টা ও পরমেশ্বর। বহু ইশ্বরবাদ মানুষের কল্পিত। কেননা বিশ্বের সকল জাতিকে তাদের ধর্মগ্রন্থে একেশ্বরবাদেরই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সকল অবতার একশ্বর বাদী ছিলেন।

পৃথিবীর বুকে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান নানা জাতির বসবাস আর পরমেশ্বর আল্লাহ্‌র কৃপাবারি আমাদের ওপর সমভাবে বর্ষিত হয়। সূর্যের আলো, বৃষ্টির পানি, বায়ু, অগ্নি, আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত। তখন মুসলমান বা হিন্দুর জন্য তাঁর কৃপা কম-বেশী হয় না। হিন্দুর চুলায় কি আগুনের দাহিকা শক্তি মুসলমানের চুলার চেয়ে বেশী হয়? না, এমন হয় না। বর্ষার পানি হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত বেছে বেছে বর্ষিত হয় না। সূর্যের আলো সকলকে সমানভাবে আলোকিত করে। যদিও এগুলি একই উৎস থেকে আসে। আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টির কল্যাণের জন্য এগুলি সৃষ্টি করেছেন। ধর্মের বেলায় যদি সেই একই উৎস আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিধান দাতা হন তবে তাঁর ধর্মশিক্ষায় তারতম্য হবে কেন? আমরা সকলে জানি, সভ্যতার আদিতে মানুষ গাছের পাতা দিয়ে পোষাক বানাত। তাতেই ইজ্জত আব্রু ঢাকার ব্যবস্থা করত এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ হত। এখনকার যুগে আমরা যে পোষাক ব্যবহার করি তা উন্নত মানের কাপড় দ্বারা তৈরী। তার কাজ সেই একই। ইজ্জত ঢাকা ও সৌন্দয্যের জন্য।

আমরা পূর্বপুরুষদের গাছের ছালবাকল বা পাতার পোশাক কি ব্যবহার করি? এখন তো নানান রঙের, নানা ঢঙের নামি দামি পোশাক মানুষ ব্যবহার করে। আগে মানুষ পায়ে হেটে ধর্ম প্রচার করত, মুখে মুখে প্রচার হত। এখন উন্নত সভ্যতার মিডিয়ার কল্যাণে রেডিও, টেলিভিশন, বই পুস্তক, পত্র পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের কাছে ধর্মের বাণী পৌঁছে যায়। বিভিন্ন ধর্মের বাণী শুনে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ পায়। তাই বলে কি আমরা বলতে পারি যে, রেডিও, টেলিভিশন, বা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে আমরা ধর্মের বাণী শুনব না। এই ক'দিন আগেও আমাদের বাপ দাদারা ধূতি পরিধান করত, ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, হাতি, গাধা ছিল তাদের যানবাহন। এখন আমরা তা ব্যবহার করি না। আমরা উন্নত ও আধুনিক যানবাহন ব্যবহার করি। যা দ্রুতগামী ও সময় বাচায় এবং আরাম দায়ক বটে।

ক্রমবিকাশমান মানব সভ্যতার উদ্ভবের কারণে আমরা অতীত অনুন্নত জিনিষের পরিবর্তে নতুন ও উন্নততর জিনিষ ব্যবহার করি। এখন উন্নত ও আধুনিক জিনিষ অনুন্নত ও পুরনো জিনিষের জায়গায় স্থান করে নিয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। হাজার হাজার বছরের পুরান আইন বর্তমান যুগের জন্য অচল প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দুদের বেদ, মহা ভারত, উপনিষধ পুরান ইত্যাদি অনেক পুরান। বেদ প্রায় ৪৫০০ শত বছর আগের। তার বিধান বর্তমান যুগের জন্য তার কার্যকরিতা অচল হয়ে গেছে। বর্তমান আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবিক উৎকর্ষতার যুগে ঐ সব ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা অপূর্ণ সাব্যস্থ হয়েছে। দু একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবেঃ–

১। মনুস্মৃতি- ১০:৩৫ ঃ- যদি কোন ব্রাহ্মণ

শুদ্রের নিকট থেকে টাকা ধার নেয় এবং ব্রাহ্মণ তা শোধ করতে না পারে তবে তাকে মাফ করে দিতে হবে। কিন্তু যদি কোন শুদ্র ব্রাহ্মণের কাছ থেকে টাকা ধার নেয় আর যদি পরিশোধ করতে না পারে তবে তাকে ব্রাহ্মণের বাড়িতে খেটে দিতে হবে। এতে কি সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা হল, এখনকার যুগে কি এরকম সম্ভব।

২। গৌতম স্মৃতি ১২ ঃ- যদি নিম্ন বর্ণের কোন লোক বেদের কোন শ্লোক দৈবাৎ শুনে ফেলে তাহলে রাজার কর্তব্য হবে গলিত শিসা বা মোম দ্বারা তার কান বন্ধ করে দেয়া। যদি সে ধর্মগ্রন্থের কোন বাণী পাঠ করে তাহলে তার জিহ্বা কেটে দিতে হবে। যদি সে বেদ গ্রন্থ পাঠ করে তাহলে তার দেহকে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলতে হবে।

৩। হিন্দু ধর্মে জাতিভেদ শ্রেণীভেদ ব্যাপক। বেদের শিক্ষায় নারীদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। নারী পুরুষের সমঅধিকার তাদের ধর্মগ্রন্থে নেই। নারীদেরকে ভোগের পাত্র এবং পাপিষ্ট হিসাবে নিকৃষ্ট জীবে পরিণত করা হয়েছে, যা বর্তমান সভ্যতার যুগে কেউ মানতে পারে না। রাজা রামমোহন রায় নারীদেরকে সহমরণ থেকে রক্ষা করেছেন।

৪। হিন্দু ধর্মে মানুষকে মানুষের আসন থেকে উন্নীত করে দেবতায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ একজন নারীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, তিনি বিবাহ করেছিলেন, তার অনেক স্ত্রী ও বহু সন্তান ছিল। তিনি ঈশ্বরের অবোতার ছিলেন, মানুষের মত আহার-বিহার, খাওয়া, ঘুম, প্রস্রাব-পায়খানা ছিল কিন্তু তাকে অতিভক্তের দল ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে উন্নীত করে তার পূজা করেছে।

৫। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে মানুষ তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইচ্ছামত প্রক্ষেপন করেছে, টিকা টিপ্পনী বসিয়েছে।

৬। শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ বলেছেন, অতি প্রাচীন কালে বেদের গুড়ার্থ গুরু শিষ্য পরম্পরাক্রমে অধিগত হত, তা লিপিবদ্ধ হত না, উহা বহু পূর্বেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পরে বেদার্থ যিনি যেরূপ বুঝেছেন তিনি সেরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এবং তদনুসারে নানা মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "এই বেদের শতকরা ৯৯ ভাগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে (ভারতে বিবেকানন্দ ৬১০ পৃঃ) ফলে এসব গ্রন্থ মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে নির্দিষ্ট লক্ষে পৌঁছবার আর কোন সুযোগ নেই।

৭। এসব গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ যখন একদেশ অন্যদেশ সম্বন্ধে কিছু জানত না এবং পারস্পরিক যোগাযোগের কোন সুযোগ ছিল না। তাই সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতির জন্য তাদের প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষা তাদের অবতারদের মাধ্যমে দান করেছিলেন। এখন ঐ সব ধর্মগ্রন্থের শিক্ষা বর্তমান উন্নত মানব সভ্যতা এবং মানুষের বিবেক ও চিন্তাশক্তির চূড়ান্ত উৎকর্ষতার যুগের জন্য আর গ্রহণযোগ্য থাকে নি। এর কারণ ঐ সব ঐশী বাণীর যুগ শেষে আল্লাহ্ তা'লা বর্তমান যুগের প্রয়োজনিয়তার দিকে লক্ষ্য করে বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন (আল কুরআন ৮১:২৮) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন। (আল কুরআন ৩৪:২৯) আর এ গ্রন্থ পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সমর্থন রয়েছে (আল কুরআন ১০:৩৮) এবং অতীতে আগত সকল শিক্ষার নির্যাস এতে রয়েছে (আল কুরআন ২১:৫১) আর মানব মাত্রই এক জাতি (আল কুরআন ২:২১৪)। হিন্দু ধর্মের এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মগ্রন্থের এটা বিধিলিপি, কেননা আল কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ্ ঐ সকল ধর্মের ঐশী বিধান গুলি বিস্মৃত হতে দিয়েছেন। যেহেতু আল কুরআন ভবিষ্যতের সকল মানবের জন্য চিরস্থায়ী বিধান। তাই এটাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন (আল কুরআন ১৫:১০)। ইহা সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত শিক্ষা, কেয়ামতকাল ব্যাপী এ শিক্ষা বা এর বিধান পরিবর্তন হবে না। কলি যুগাবতার যিনি মুসলমানদের মাহ্‌দী, হিন্দুদের কৃষ্ণ, খৃষ্টানদের মসীহ্, বৌদ্ধদের মত্রীয়, যিনি সকল ধর্মগ্রন্থের ঐশী প্রতিশ্রুত মোতাবেক শেষ যগে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ঐশী বাণী লাভ করে বলেছেন, "ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্মে কোন না কোন ভ্রান্তি রয়েছে, এর কারণ এই নয় যে, সেসব ধর্ম প্রথম থেকেই মিথ্যা বরং এটা এজন্য যে, ইসলামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ্ তা'লা ঐ সব ধর্মের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এখন ঐ সব ধর্ম এমন বাগানে পরিণত হয়েছে যার কোন মালি নেই। তিনি আরও বলেছেন, "অনেক ভুল ভ্রান্তি সে সব ধর্মে এমন ভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়, যেভাবে বহুল ব্যবহৃত কাপড় কখনও না ধোওয়া হলে ময়লা ধরে রাখে। আর এমন সব মানুষ যাদের আধ্যাত্মিকতার সাথে কোন সম্বন্ধ ছিল না এবং যাদের অবাধ্য আত্মা নীচ ও হীন জীবনের কলূষতা থেকে মুক্ত ছিল না তারা কামনা বাসনার তাগিদে সে সব ধর্মে অযথা হস্তক্ষেপ করেছে এবং সেগুলোর চেহারা এমনভাবে বিকৃত করেছে যে, আজ সে সব ধর্ম ভিন্ন কিছু বলে মনে হয়।" (লেকচার শিয়ালকোট)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর আল কুরআন নাজিল করেছেন এবং একে পরিপূর্ণ কেতাব বলে ঘোষনা করেছেন এবং ইসলাম ধর্মকে বিশ্বাসীর জন্য মনোনীত করেছেন। তাই এখন ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের জাতিগুলোর কাছে পৃথক পৃথক ভাবে কোন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে কোন অবতার আর আসবেন না। সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে বেদ অবতীর্ণ হয়। ভারতের সেই সময়ের মানুষদের হেদায়াত লাভের জন্য। তখনকার যুগের মানুষের বিবেক শক্তি যতটুকু উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল বেদের ঐশীবাণী তাদের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। এখন যেমন মানুষের বিবেক শক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধি চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে তখন এমনটি হয় নাই। বর্তমান মানুষের জন্য তাই চূড়ান্ত ধর্ম বিধান আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কেয়ামত কালব্যাপী সারা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য। কেয়ামতকাল ব্যাপী মানুষের সকল সমস্যার সমাধান এতে রয়েছে। কিন্তু একটি আদি স্বভাব বা ত্রুটি মানবের মধ্যে রয়েছে তাহল আল কুরআনে আল্লাহ্ বলেছেন "আর এমনটি ইতিপূর্বে হয়ে এসেছে–আমরা তোমার পূর্বে কোন জনপদে এমন কোন সতর্ককারী পাঠাইনি–যার স্বচ্ছল লোকেরা একথা বলে যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠিত দেখতে পেয়েছি এবং আমরা তাদের পথ অনুসরণ করছি। কিন্তু আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর দেখতে পেয়েছ আমি এর চেয়ে উত্তম হেদায়াত নিয়ে এলেও কি"

অথচ আল্লাহ্ বলেছেন– "বর্তমান কালের মানুষ যে তাদের বাপদাদাদের অনুসরণ করছে তারাও সব কিন্তু অনুমানের ওপর চলত, তাদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না।" (সূরা যুখরুফ ৪৩: ২১-২৫)

(চলবে)

অনুভূতির জলসা নিউজিল্যান্ড

ফারজানা আক্তার (ঊষা)
ওয়েলিংটন, নিউজিল্যান্ড

আমি অতি সাধারন একজন আহমদী মায়ের সন্তান। সময় বয়ে যায় কিন্তু এরই মাঝে ঘটে যাওয়া কিছু স্মৃতি, অনুভূতি থাকে যা ভুলা যায় না। আজ আমি এমনই একটি অনুভূতির কথা আপনাদের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ হওয়া কোন স্বপ্ন পূরণের চাইতে কম নয়। আমার বিয়ের পর ২০১০ সালে আমি নিউজিল্যান্ড আমার স্বামী এবং শ্বশুরের বাসায় আসি। এখানে এসে তাদের পুরো পরিবারকে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে একটি ছবির ফ্রেমে বাঁধানো দেখে নিজেকে খুব মিস করতাম, ভাবতাম বিয়েটা আরও চার বছর আগে হলে হয়তো আমিও এই ফ্রেমের অংশ হতে পারতাম। তাহাজ্জুদ নামাজেও দোয়া করেছি, আবার যদি হুযূর (আই.) আসতেন অথবা কোনভাবে যদি হুযূর (আই.)-এর স্বাক্ষাত লাভ হতো!

আল্লাহ্ তা'লা আমার সেই ডাক শুণেছেন। মহা সুসংবাদ পেলাম, হুযূর (আই.) প্রাচ্যের দেশ সমূহ পরিদর্শন করবেন এবং এর অংশ হিসেবে নিউজিল্যান্ডেও আসবেন। আল্লাহ্‌র কাছে হাজারও শুকরিয়া আদায় করলাম, হুযূর (আই.)-কে কমপক্ষে এক নজর দেখতে তো পারবো! হুযূর (আই.) অকল্যান্ডে আসবেন। সেখানে তিন দিনের একটি জলসা হবে আর সেখানে আমি হয়তোবা কর্মি হিসেবে কাজ করারও সুযোগ পাবো। এমনটি ভাবতাম আর আনন্দের জোয়ারে ভাসতাম। হঠাৎ করেই সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল, আমার স্বামী জনাব ইমরান আহমদ একটি চাকুরীতে যোগদান করেন আর সেটি হয় ওয়েলিংটনে। একদিক থেকে স্বামীর ভাল চাকুরী পাবার আনন্দ অন্য দিকে মনটা খারাপ হয় এই ভেবে, "আর বুঝি আসন্ন জলসার কর্মি হওয়া হলোনা, হুযূর (আই.)-এর সাথেও বুঝি সাক্ষাত করা হলো না"। তবুও হাল ছাড়িনি। কারন আমি জানি আমার এই আকাঙ্খা উত্তম ও পবিত্র। যখনই হুযূর (আই.)-এর কাছে চিঠি লিখি, প্রতিউত্তরে তিনি একটি কথা লিখেন, আর তা হলো, "আপনার উত্তম ইচ্ছা সফল হোক"। এই ভরসায় ওয়েলিংটন হতে সদর লাজনা ইমাইল্লাহ, নিউজিল্যান্ড জনাবা বুশরা ইকবাল সাহেবাকে একটি নযম পরিবেশনের সুযোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানাই। এর আগে অকল্যান্ডে লাজনা ইমাইল্লাহর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমি নযম পেশ করেছিলাম এবং একবার একটি প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থানও অর্জন করেছিলাম। সেই সুবাদে তিনি আমাকে চিনতেন এবং জানতেন। হুযূর (আই.) এবং তার বিবি সাহেবার সামনে পরিবেশনের জন্য দু'টি নযম নির্ধারন করা হয়। আমি উর্দ্দুতে নযম গাইতে চাইলে তিনি বলেন, "তুমি বাঙালী, তাই তোমার উর্দ্দু উচ্চারণ কোন কারনে ভুল হতে পারে। আর আমরা হুযূর (আই.)-এর সামনে সবকিছু নির্ভুলভাবে পেশ করতে চাই"।

আমি তাদেরকে অনেকটা অবুঝের মতো অনুরোধ করি, তারা যেন কমপক্ষে আমাকে একটিবার চেষ্টা করার সুযোগ দেন। নইলে সারা জীবন বড় আক্ষেপ থেকে যাবে। চেষ্টায় যদি উত্তীর্ণ না হতে পারি মনে কোন কষ্ট থাকবেনা। এমনকি আমি বাংলা নযমও করতে চাইলাম, তাতেও তারা রাজী হচ্ছিল না। বিভিন্ন ভাষায় সমাপ্তি অধিবেষনের জন্য কিছু নযম নির্ধারণ করছেন, সেখানেও বাংলা নেই। কথাটা শুনে একটু কষ্ট পাচ্ছিলাম। যাই হোক, আলহামদুল্লিাহ, অবশেষে আমাকে একটি অডিশন দেবার সুযোগ তারা দিয়েছেন। যেহেতু অকল্যান্ড হতে ওয়েলিংটনের দুরত্ব ৬৫০কি.মি.। আমার অডিশন নেওয়া হল টেলিফোনে। আমি সবার শেষ প্রতিযোগী ছিলাম। বসে আছি কখন ফোন আসে। আমার ছোট্ট কন্যা শিশুর ঘুম না আবার ভেঙ্গে যায়। আলহামদুল্লিাহ, সেই কাঙ্খিত ফোন আসল। আমার মেয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমি টেলিফোনে অডিশন দিলাম। সকলের মধ্য থেকে দুইজনকে বাছাই করা হলো এবং সকল প্রশংসা আল্লাহ পাকের, আমি তাদের মধ্যে একজন। আনন্দে আমি কেঁদে ফেল্লাম। জীবনে প্রথম অনুভব করলাম কিভাবে আনন্দেও অশ্রু বিসর্জন হয়।

তারপর এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। প্রতিক্ষীত সেই জলসা। সুন্দর আধ্যাত্মিক পরিবেশ, সবকিছু খুবই গোছানো এবং পরিপাটী। এর মধ্যে অকস্মাৎ হুযূর আই. এর বিবি শ্রদ্ধেয় আপাজানের সাথে দেখা হয়ে গেল। এক ধরনের অদ্ভুত নুর তাদের মধ্যে অবস্থান করে। আমি আমার মেয়ের মুখে ক্রিম লাগাচ্ছিলাম। ঠিক তখনই পিছন থেকে এক ভদ্র মহিলা বলে উঠলেন, "কিয়া কাররাহিহো? বাচ্চিকো মেক আপ কাররাহিহো?"পেছনে ফিরে তাকাতেই বুঝলাম তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় আপাজান। আমি উনার কাছে ছুটে যেতেই তিনি আমার গালে চুমু খান এবং আমার মেয়ে ইনশিরাহ ঈমানী'কে দোয়া করেন এবং আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

এবার লাজনা ইমাইল্লার প্রথম অধিবেশনের কথা বলি। অধিবেশনের শুরুতেই আমি মসীহ মাওউদ (আ.) রচিত উর্দ্দু নযম, "এ্যা খোদা এ্যা কার ছা যো" পেশ করলাম। এই অধিবেশনের পরে হুযূর (আই.) আশার পূর্বে আমরা যারা ছোট বাচ্চার মা তাদেরকে একটি কাঁচে ঘেরা শব্দরোধক ঘরে নিয়ে যাওয়া হল যেখান থেকে আমরা হুযূর (আই.) দেখতে পাব কিন্তু শব্দযন্ত্রের বিভ্রাটের কারনে বক্তব্য শোনার কোন উপায় সেখানে ছিলনা। আর আমরা বাচ্চার মা'দের সংখ্যার তুলনায় সে স্থানটুকু অপ্রতুল ছিল তাই আমরা হুযূর (আই.)-কে দেখতেও পাচ্ছিলাম না। আবার বাচ্চা নিয়ে মূল হলে যাবার উপায় নেই, কারন একাধিক বাচ্চার সমন্বিত শব্দে হুযূর (আই.) এর বক্তব্য প্রদান বাধাগ্রস্থ হতে পারে। মনটা একটু ছোট হয়ে গেলো, মনে মনে ভাবছি একটু যদি ভিতরে যাওয়া যেতো! ভিতরে অবস্থিত সকলের মনের অবস্থা একই ছিল। হুযূর (আই.) যেন আমাদের মনের অবস্থা অনুধাবন করলেন। একটি বাচ্চা ঘুমিয়ে যাওয়ায় তাকে নিয়ে তার মা আর মূল হল থেকে সরতে পারেননি। যখন বাচ্চা উঠে গেলো তখন তিনি দ্রুত মূল হল ত্যাগ করতে থাকলে বিষয়টি হুযূর (আই.) এর দৃষ্টিগোচর

হয়। তিনি বক্তব্যের মাঝখানেই বলে বসলেন, "বাচ্চোকি মায়ে কিধার হ্যায়? সবলোক আযাইয়ে"। শব্দ বিভ্রাটের মাঝেও এই বাক্য আমাদের কানে এলো এবং আমরা সবাই আনন্দে একসাথে চিৎকার করে উঠলাম। সবাই একদৌড়ে বাচ্চাদের নিয়ে মূল হলে চলে আসলাম এবং সামনে থেকে হুযূর (আই.)-এর বক্তব্যের বাকী অংশ শুনলাম। অধিবেশন শেষে বিভিন্ন দেশের ভাষায় দলীয় নযম হচ্ছিল। সবার নযম শোনা শেষে হুযূর (আই.) বলে উঠলেন, "বেঙলী নযম কিধার হ্যায়? কোই বাঙ্গালী নেহী হ্যায়?" এই ছোট্ট দুইটি প্রশ্নে আবার বাঙ্গালীদের প্রতি হুযূর (আই.)-এর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটল। সদর সাহেবা আমার দিকে ইশারা করলেন। আমি হুযূর (আই.)-কে সালাম বলে মাইক্রোফোন হাতে নিতেই আনন্দ ও ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। হুযূর (আই.) বিষয়টি লক্ষ্য করে আমাকে বললেন, "আরামছে, আরামছে, ব্যাঁঠ যাও"। ঐ মুহূর্তে কোন বাংলা নযমই মনে আসছিলনা। যেহেতু আমার বাবা-মা তখন সবেমাত্র হজ্জ করে ফিরেছেন। তাই সবসময় একটি নাথ আমার মনে বাজতো আর সেটি হলো আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা:

"আমি যদি আরব হতাম, মদীনারই পথ,
যেই পথে মোর চলে যেতেন নূর নবী
হযরত"।

আমি সাহস করে চোখ বন্ধ করে এই নাথটিই পরিবেশন করলাম। হুযূর (আই.) বললেন, যাযাকাল্লাহ। চোখ খুলে তাকাতেই দেখি ফিজিয়ান, পাকিস্তানী সব বোনদের চোখে পানি। এক পাকিস্তানী বোন এসে বললেন, "আমরাতো বাংলা বুঝিনা, তোমার ভাষা আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি, কিন্তু সুরটা এতো করুন এবং মধুর ছিল যে আমরা কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি, দেখো আমরা সবাই কাঁদছি"। সেদিন মসজিদের সবাই আমাকে এতো আদর ও দোয়া দিয়েছিল, আমি তা কখনও ভুলতে পারবোনা। তারপর হুযূর (আই.) সালাম ও বিদায় সম্ভাষন জানিয়ে প্রস্থান করলেন। আমরা সবাই তাঁকে সালাম ও বিদায় সম্ভাষন জানালাম।

শেষদিন শেষ অধিবেশন শেষে শ্রদ্ধেয় আপাজান এর সাথে দেখা হল আমাদের সকলের। তিনি আমাদের সকলের সাথে বিদায় মুলাকাত করলেন মহিলা জলসা গাহে। আমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে তার সাথে করমর্দন করলাম এবং সালাম বিনিময় করলাম।

পরবর্তীতে হুযূর (আই.)-এর সাথে পারিবারিক মুলাকাৎ এর সুযোগ হয়। হুযূর (আই.) আমাকে দেখে চিনতে পারেন এবং আমার শশুর জনাব শরীফ আহমদ সাহেবকে ডেকে বলেন, "উনুনে বহৎ আচ্ছা পয়েম বোলা"। এই স্বিকৃতি আমার আনন্দকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। হুযূর আমার মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে আদর করলেন এবং তার জন্য দোয়া করলেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে আমার মেয়ের হাতে একটি চকলেট দিলেন। মেয়ের হাত থেকে চকলেট ফসকে গেলে হুযূর কাউকে কোন সুযোগ না দিয়ে নিজেই ফ্লোর হতে চকলেটটি আবারও তার হাতে দেন।

এই হল আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.), এমন আধ্যাত্মিক ধনভান্ডার তার অধীনে থাকা স্বত্ত্বেও কি অনন্য সাধারণ নিরহংকার ব্যাক্তিত্ব। তেমনি অসাধারন আমাদের শ্রদ্ধেয় আপাজানও। তাদের অতি সাধারণ আচরণই তাদেরকে আরও বেশি অসাধারণ করে তুলেছে। সবশেষে পরিবারের সকলকে নিয়ে হুযূর (আই.)-এর সাথে একটি ছবি তোলা হল। আলহামদুলিল্লাহ, এখন বলতে পারি, আমিও সেই ছবির ফ্রেমের একজন। সবশেষে কিছু অপূর্ণতা থেকেই যায়। সেই সময়টাতে আমার মা বাবাকে মিস করেছি। আমি যদি দেশে (বাংলাদেশে) থাকতাম আর হুযূর (আই.) বাংলাদেশে আসতেন তাহলে হয়তো আমার ছবির সংখ্যা হত দুই। আমার মা বাবার সাথেও হয়তো আরও একটা ছবি থাকতো। আল্লাহ করুন হয়তোবা এমনটিও কখনও হতে পারে, যেখানে হুযূর (আই.)-এর সাথে আমার মা বাবা এবং ভাইবোনদের নিয়েও একটি ছবি উঠে গেলো।

আমার এই অনুভূতির গল্প ধৈর্য্য সহকারে পড়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, মহান আল্লাহ্ পাক যেন আপনার এবং আমাদের সকলের জীবনে এমন মুহূর্ত সমূহের পূণরাবৃত্তি ঘটান যাতে করে বারবার হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাত লাভের মাধ্যমে সরাসরি তার কাছ হতে কল্যাণ লাভ করতে পারি। আমীন।

দৃঢ়তা সম্পর্কে কিছু কথা

যাবতীয় সকল উত্তমকার্যে সাড়া প্রদানই নৈতিকতা। আর নৈতিক বিষয়গুলোকে কার্যে পরিণত করার পেছনে ব্যবহৃত কাজকেই দৃঢ়তা বলা হয়। মানবজীবনে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী চরিত্র হলো দৃঢ়তা। দৃঢ় চরিত্রের প্রকাশ সাধারণত আমরা দু'ভাবে দেখে থাকি।

(১) প্রথমত বহি:প্রকাশ এবং (২) দ্বিতীয়ত: অন্ত:প্রকাশ। একজন দৃঢ়চরিত্রবান ব্যক্তির মাঝে দু'টো গুণই স্পষ্ট। নৈতিক জ্ঞান প্রাপ্ত ব্যক্তি যখন, ইসলামের নৈতিক শিক্ষাগুলোকে নিজ আমলে পরিণত করেন, প্রয়োগ করেন, তখন তার হৃদয়ে এক অসাধারণ কর্মশক্তি, প্রেরণাশক্তি সঞ্চিত থাকে। এ সঞ্চিত শক্তিই দৃঢ়তার অন্তঃপ্রকাশ। আর এর প্রভাবে ব্যক্তি যে কার্যটি সম্পন্ন করছে, তা হলো দৃঢ়তার বহি:প্রকাশ।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, ব্যক্তির হৃদয়ে বিদ্যমান সঞ্চিত শক্তি, কর্মশক্তি কিংবা প্রেরণা শক্তির উৎস কোনটি? আমরা জানি, একমাত্র সংকল্প মানুষের ইচ্ছাগুলোকে সু-শৃঙ্খল আকারে সাজাতে সক্ষম এবং এর ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ জীবনের এক বা একাধিক স্বপ্ন পূরণে স্বার্থক হোন। তাহলে শুধু সংকল্প শক্তিই কি সকলের জীবনে স্বার্থকতা বয়ে আনে? না। ইচ্ছা শক্তি সবারই থাকে, তাই এর সাথে প্রয়োজন কর্মশক্তির। কর্মশক্তি ও সংকল্প শক্তির প্রভাবে ব্যক্তির হৃদয়ে যে প্রেরণাশক্তি কাজ করে, সেটাই দৃঢ়তা।

অনেক সময় আমরা দেখি, অতি সাধারণ লোকজনের মাঝেও প্রেরণা শক্তির উঠা নামা করে। এমনকি পাপী ব্যক্তির হৃদয়েও ধর্মীয় আবেগ, অনুভূতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেটা অস্থায়ী। কেননা, সংকল্পহীন ব্যক্তি "ইবলিশ শয়তান" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় কি? সংকল্প শক্তির পর কর্মশক্তির প্রয়োজন। যার মাঝে কর্মশক্তিই নেই, তার প্রেরণা শক্তি কি করে কাজে লাগতে পারে?

কর্মশক্তি ও সংকল্প শক্তির বিষয়টি হাদীস দ্বারাও স্পষ্ট হয় যেমন, 'ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়্যাত' অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কাজের ফলাফল সংকল্পের ওপর নির্ভরশীল সুতরাং সংকল্প শক্তির গুরুত্ব অনেক। সংকল্প শক্তির ফলে শরীরে কর্মশক্তি আসে আর তজ্জন্যই প্রেরণা শক্তিটি কাজে আসে। তবে এই ৩ শক্তির উপস্থিত সমান হওয়া অত্যাবশ্যক আর এই ৩ শক্তির ব্যবহারই দৃঢ় চরিত্র।

রেজোয়ানা করিম রোদেলা
আহমদনগর, পঞ্চগড়

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

সুদ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বলেই আল্লাহ্ সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন

আজকের সমাজে আর্থিক লেনদেন এবং এর মধ্যে ঋন হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে সমস্ত কাজে সুদ ধার্য করা হয় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ঋণদাতা কার্যতঃ অপরের দুঃখ দৈন্যের সুযোগ গ্রহণ করে এবং লাভবান হয়, এ জন্য সুদকে ইসলামে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

সূরা বাকারার ২৭৬ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা সুদের মন্দ প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। সুদ এমন একটি জিনিষ যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর কারণ হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন যে যদি কোন উপায় না থাকে বা বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সুদ বৈধ। এ বিষয়ে যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন– ক্ষুধার তাড়নায় শূকর খাবার এবং ব্যাধি হলে যখন মানুষ ক্ষুধার কারণে মরতে বসে তখন অনুমতি আছে কিন্তু কোন ভাবেই সুদের অনুমতি নেই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুদ ও ঋণ গ্রহণকারীদেরকেও ঐ দলে গণ্য করেছেন যারা খোদার সাথে প্রকাশ্যে যুদ্ধ করে। আর সুদে যারা ঋণ দেয় তারাতো খোদার নির্দেশের প্রাকাশ্য বিরোধী। (পাক্ষিক আহমদী, ৩১ আগষ্ট ২০০৮) হযরত রসূল করীম (সা.) সুদ দাতা এবং সুদ গ্রহণকারী উভয়কেই অভিশাপ দিয়েছেন (মুসলিম)।

সুদ সম্পর্কে মহানবী (সা.) আরো বলেছেন– সুদের মাত্র একটি রৌপ্য মুদ্রাও যে ব্যক্তি জেনে শুনে খায় তার গোনাহ ছত্রিশবার জিনা করা অপেক্ষা বেশী হয়। (আহমদ, দারকুতনী)

গত ১৫ই জুন ২০০৭ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদে তাঁর খুতবার একাংশে সুদ সম্পর্কে বলেন ঃ সুদ সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই আল্লাহ্ তা'লা সুদ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। যে ব্যবসায়ীক লেনদেনে সুদ দেওয়া নেওয়া হয় তার পরিণতি খুব মারাত্মক হতে পারে। অল্প সময়ের মধ্যেও বিত্তশালী ব্যক্তিরাও দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে, আল্লাহ্ প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার ফলেই এমন হয়ে থাকে। সুদের নিষেধাজ্ঞার প্রতি আহমদীদের সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–যদি সুদের লেনদেন থেকে বিরত না হও তাহলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা কর। (সূরা বাকারা ঃ ১৭৯)

একদা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সম্মুখে কেউ একজন বর্ণনা করেন যে বিভিন্ন সমস্যা এমন দেখা দেয় যার ফলে সুদে ঋন নিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় আমরা কি করবো? এর উত্তরে তিনি (আ.) বলেন–যে ব্যক্তি খোদা তা'লার ওপর ভরসা করে খোদা তার দারিদ্রতার মধ্যেই কোন না কোন উপকরণ সৃষ্টি করে দেন। পরিতাপ যে, মানুষ রহস্য বুঝে না, মুত্তাকীদের জন্য খোদা তা'লা কখনও এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন না যাতে সে সুদে ঋন গ্রহণে বাধ্য হয়। স্মরণ রেখো! যেভাবে অন্যান্য পাপ রয়েছে উদাহরণ স্বরূপ ব্যভিচার এবং চুরি, তদ্রুপ পাপই সুদ দেয়া এবং নেয়া। এটি কত বেশী ক্ষতিকর যে, সম্পদও যায় সম্মানের হানি হয় আর ঈমানও হারায়। (১৫ই জুন ২০০৭ এর খুতবা)

অনেকে মনে করেন যে, পোষ্ট অফিসে ৩-৫ বছর বা এর অধিক মেয়াদে টাকা জমা রেখে যে অতিরিক্ত টাকা উত্তোলন করা হয় তা সুদ নয়।

এ প্রসঙ্গে আহমদীয়া জামা'তের সম্মানীত প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাউদ (আ.) বলেন– "শরিয়তে সুদের সংজ্ঞা হচ্ছে–কোন এক ব্যক্তি নিজের লাভের জন্য কাউকে টাকা ঋন দেয়, আর তাতে লাভ নির্ধারণ করে দেয়। এ শর্তগুলো যেখানেই পূর্ণ হবে সেটাকেই সুদ বলা হবে। কিন্তু যে টাকা নিয়েছে যদি সে কোন প্রতিশ্রুতি না দেয়, বরং নিজের পক্ষ থেকে কিছুটা বাড়িয়ে ফেরৎ দেয়, আর যে সেটা সুদ হিসেবে না দেয়, তাহলে এটা সুদের মাপে গণ্য হবে না। এটা বাদশার পক্ষ থেকে এহসান (অনুগ্রহ) স্বরূপ হবে।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) যখনই কোন ঋন নিতেন, তা ফেরৎ দেবার সময় অবশ্যই কিছুটা বাড়িয়ে ফেরৎ দিতেন। তবে এটা দৃষ্টিতে রাখতে হবে– নিজের লোভ-লালসা ছাড়া যেটা বাড়তি পাওয়া যাবে সেটা সুদ নয়।"

"সরকার থেকে যে টাকা পাওয়া যায়, তা তখন সুদ হবে যখন কেউ সুদ পাবার আকাঙ্খায় টাকা রাখবে। নতুবা সরকার নিজ পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ যা দিবে তা সুদ হবে না।" (মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃঃ ১৬৬-১৬৭)

অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপরোক্ত লেখা থেকে বুঝা যায়, ব্যক্তি, সরকার, পোষ্ট অফিস সবার ক্ষেত্রে যদি কেউ সেখানে লাভ নির্ধারণ করে টাকা রাখে অথবা লাভ পাবার আশায় টাকা রাখে তাহলে সেটা সুদের মধ্যে গণ্য হবে। তবে সরকার যদি বলে বা ঘোষণা দেয় আমরা সুদ দিচ্ছি না, আমরা জনগণকে আমাদের পক্ষ থেকে পুরস্কার স্বরূপ দিচ্ছি। তাহলে সেটা রাজা বাদশার অনুগ্রহ হিসেবে গণ্য হবে এবং সরকার যদি সঞ্চয়কারীকে পুরস্কার হিসেবে কিছু দেয় তাহলে তা তোহফা হবে।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষার ওপর সঠিক আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মিলা পাটোয়ারী, আহমদনগর, পঞ্চগড়

ইসলামে সুদকে কঠিনভাবে হারাম করা হয়েছে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'যারা সুদ খায় তারা সেভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান বুদ্ধি হারা করে ফেলে। এটা এ কারণে যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয়ও সুদের মত; অথচ আল্লাহ্ ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রভুর পক্ষ হতে কোন উপদেশ আসে এবং সে বিরত হয়, তাহলে অতীতে যা কিছু হয়েছে তা তারই এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট ন্যাস্ত। এবং যারা পুনরায় ইহা করবে, তারা নিশ্চয় অগ্নিবাসী হবে; সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।' (সূরা বাকারা ঃ ২৭৬)

পবিত্র কুরআনে সব ধরনের সুদকে হারাম করেছেন। এছাড়া কুরআনের বহু স্থানে সুদ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে এবং সুদ খাওয়া নিষেধ করেছেন। অথচ আধুনিক কালে ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুদ একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়। ব্যাংক, বিভিন্ন সমিতি যেভাবে সমাজে মানুষের কল্যাণের নামে অকল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে তাতে মানুষের নৈতিক চরিত্র ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে সমাজ থেকে ইসলামী শিক্ষা উঠে যাবে এবং পূর্বের আরবের অবস্থার ন্যায় হয়ে এটাই প্রতীয়মান হয়।

সুদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, শরীয়তের সুদের সংজ্ঞা হল– কোন ব্যক্তি যদি নিজের লাভের জন্য অন্যকে ঋনস্বরূপ টাকা দেয় এবং লাভ নির্দিষ্ট হারে নেয়, তাহলে তা সুদ হবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি টাকা নেয় এবং অঙ্গীকার না করে, বরং নিজের পক্ষ হতে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে এটা সুদ বলে গণ্য হবে না। নবীরা যখন ঋন গ্রহণ করতেন তখন অবশ্যই অতিরিক্ত টাকাসহ ঋন ফেরৎ দিতেন। (ফিকাহ্ আহমদীয়া)

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তা সুদ।" (জামেউস সগীর) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সুদের গুনাহ এর সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতাকে বিবাহ করে। (ইবনে মাজাহ, বায়হাকী)

হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "সুদের মাত্র একটি রৌপ্য মুদ্রা যে ব্যক্তি জেনে শুনে খায় তার গুনাহ ছত্রিশ বার জেনা করা অপেক্ষা বেশী হয়।" পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে সুদকে কত কঠিনভাবে হারাম করা হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য হিসেবে আমাদেরকে অন্যদের তুলনায় পৃথক হতে হবে। অন্যদের কাছে সুদ কোন বিষয় না হলেও আমাদের জন্য এটিকে শতভাগ হারাম জ্ঞান করতে হবে এবং এ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সুদ খাওয়া থেকে দুরে রাখুন, আমীন।

নীলিমা পারভেজ, খুলনা

সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম উপকরণ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

'সুদ' শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ 'রিবা' যার অর্থ 'অতিরিক্ত কিছু বা সংযোজিত কিছু'। টাকার ক্ষেত্রে মূল অর্থের ওপরে কিছু সংযোজন। অর্থাৎ আসল টাকা অতিরিক্ত টাকাই সুদ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে, চক্রবৃদ্ধি সুদ ও সাধারণ সুদ উভয়ই 'রিবা'র অন্তর্গত। এই ধরনের ব্যবসায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হোক, ব্যাংকের সাথে হোক, সংস্থার সাথে বা কোন পোষ্ট অফিসের সাথেই হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। সুদ কেবল টাকা কড়ি আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন সামগ্রী যদি ঋণ স্বরূপ এইরূপ শর্তে দান করা হয় যে, পরিশোধের সময় একটা পূর্বনির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্ত সামগ্রী পরিশোধ করতে হবে, তবে এটাও সুদ বা রিবা'র অন্তর্গত।

পবিত্র কুরআনে সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন–"যারা সুদ খায় তারা সেইভাবে দাঁড়ায় যেভাবে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধি হারা করে ফেলে" (সূরা বাকারা ঃ ২৭৬)। সুদ পরিহার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুদ খেয়ো না যা (ধন সম্পদ অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।" (৪ঃ১৩১)

হযরত ইবনে মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, "হযরত রসূল করীম (সা.) সুদদাতা ও গ্রহণকারী উভয়কেই অভিশাপ দিয়েছেন।" (মুসলিম) মহানবী (সা.) আরো বলেছেন, "এবং যারা সুদের কারবার লিপিবদ্ধ করে ও লেনদেনের সময় সাক্ষী হিসেবে থাকে তারা সুদ লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সুদের গুনাহের সত্তর ভাগের ক্ষুদ্রতম ভাগ এই পরিমাণ যে কোন ব্যক্তি স্বীয় মাতাকে বিবাহ করে।" (ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন, "ইসলাম প্রচারের জন্য এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুদের অর্থ ব্যবহার করা যাবে।" (আল বদর, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ সংখ্যা) মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, "এরূপ অনুমতি সকল সময়ের জন্য নয়। যখন ইসলাম তার শক্তি পুরুদ্ধার করবে এবং যখন তা এমন যে দুর্বল অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় থাকবে না, তখন আর সুদ এর প্রসারের জন্য ব্যবহৃত হবে না। তখন সুদ হারাম বলেই বিবেচিত হবে।"

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেন, "সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা হারাম উপকরণ দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত।"

বর্তমান ব্যাংকিং লেনদেনে আমরা সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ছি যা কুরআন ও হাদীস পরিপন্থী। ফলে সুদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সুদ কেবল চক্রবৃদ্ধি করে অর্থের পরিমাণই বাড়ায় না, বরং এটা যুদ্ধ বাঁধাতে এবং যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করতে ইন্ধন যোগায়। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে হালাল অন্বেষণের তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইসমত আরা চৌধুরী (উর্মি), চট্টগ্রাম

সুদ পরিহার সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা সুদ সম্পর্কে বলেন, "হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সুদ খাইও না যাহা (ধন-সম্পদ ও অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার" (৩ঃ১৩১)

"সুদ" অর্থাৎ যে সম্পদ ক্রমাগত বেড়েই চলে। সুদ সম্পর্কে ইসলামী শিক্ষা হলো– সর্বপ্রকার সুদই অবৈধ, তা অল্পই হোক আর বেশিই হোক। ইসলাম শান্তির ধর্ম। কোন রকমের অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা এই ধর্ম সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্ম ঋন আদান-প্রদানের ব্যাপারে সুদ-ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাকে মোটেও সমর্থন করে না। এই ধর্ম অসঙ্গতভাবে অর্থ উপার্জনের প্রচেষ্টাকে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধানের দ্বারা কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। 'যারা সুদ খায় তারা সেভাবে দাঁড়ায় যেভাবে সেই ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধি হারা করে ফেলে, এটা এই কারণে যে তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়ও সুদেরই মত অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন' (২ঃ২৭৬)।

নবী যিহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সুদ গ্রহণের ফলে ইহুদীরা অভিশপ্ত হিসেবে মৃত্যুবরণ করলো এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে কাফেরদের হাতে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হওয়ার জন্য বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছড়িয়ে পড়লো। মূলতঃ অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ গ্রাস করার ফলাফল ছিল এটা। কোন বদ্ধ পাগল যেমন তার কর্মের পরিণাম ভেবে দেখে না, তেমনিভাবে সুদের ওপরে ঋনদাতাগণ সুদের মারাত্মক পরিনতির কথা ভেবে দেখে না। সুদখোর যারা তারা নিজেদের ঋনের প্রতি দৃষ্টি রাখে, সমাজ তথা দেশ এবং পৃথিবীর পরিণামের কথা ভাবে না। বর্তমান যামানায় সুদ ব্যবস্থার দ্বারা সংগৃহীত অর্থ দিয়ে মরনাস্ত্র তৈরী করা খুব সহজ হয়েছে। আসলে ব্যাংকগুলো "সুদের অফুরন্ত প্রস্রবন স্বরূপ"। সুদ-ব্যবসায়ের ফলে অকল্যাণকর পরিণাম দেখা দেয় যা সমাজের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতির প্রসার ঘটিয়েছে। এই যামানায় ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন যাবতীয় কাজ কারবার মূলতঃ দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য যে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়, তা সুদভিত্তিক। ঋনের সাহায্যে দেশে যে শিল্প ও কলকারখানা গড়ে তোলা হয় এবং সে সুদের মাধ্যমে উৎপাদিত সকল কিছুই সুদের সাথে সম্পৃক্ত! এ দৃষ্টিতে বর্তমানে কেউ-ই সুদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। জীবন যাপনের সর্বক্ষেত্রেই সুদের প্রভাব। যেভাবে সুদের কারণে দ্রব্য-মূল্যের স্ফীতি মানুষের জীবন যাপনের ব্যয়কে প্রভাবিত করেছে। সুদহীন ইসলামী অর্থনীতি গড়ে তুললে আগামীতে একটি সুদ মুক্ত পৃথিবী গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ্!

বর্তমানে প্রায়ই দেখা যায় মানুষ কিস্তিতে টাকা ধার নিয়ে আয়ের পথের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে। এ ব্যবস্থাও কিন্তু সুদ-ভিত্তিক অথচ ইসলামের নীতি হলো শর্তহীন ও সুদবিহীন ঋনের ব্যবস্থা করা, যেন গ্রহীতা ঋন সময় মত পরিশোধ করতে পারে। কিন্তু গ্রহীতার পরিশোধের অক্ষমতায় তাকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করে দেবার জন্যও নির্দেশ দিয়েছেন। যাকাত প্রদানের বিধান ইসলামে আছে। এই যাকাত প্রদান পদ্ধতির দান অভাবী ও দরিদ্রের আত্ম সম্মান ও মানমর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে তাদের দারিদ্রতা মিটিয়ে থাকে। অপর পক্ষে সুদের লগ্নি দরিদ্রের অভাব তো মোচন করেই না বরং তাদের দারিদ্রতাকে ধনীদের ধন বাড়িয়ে দেয়। এদিকে অভাবীর অভাব বাড়ায়, অন্যদিকে ধনীদের ধন বাড়ায় একটা সংখ্যা গরিষ্ঠ গোষ্ঠী সম্পদের পাহাড় গড়ে। এ সবকিছুর মূলে রয়েছে সুদ। সুদহীন ইসলামী অর্থনীতিই পারে আগামী প্রজন্মকে একটি সুন্দর পৃথিবী উপহার দিতে।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

সুদ বিশ্ব সভ্যতার জন্য এক চরম অভিশাপ

সুদ ব্যক্তিসত্ত্বা, আন্তর্জাতিক, সমাজ ও বিশ্ব সভ্যতার জন্য এক চরম অভিশাপ। "দীর্ঘ অনাহারে জীবন রক্ষার্থে বিদ্রোহী না হয়ে শুকুরের মাংস ভক্ষণে অনুমতি আছে কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় সুদ গ্রহণের অনুমতি নেই।" [খুতবা খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)] সুদ প্রথা গরীবদের দিয়ে হাতী পোষণের শামিল। আর এ হাতী যারা পোষায় তারা হল আজিকার উন্নত বিশ্ব। সুদ ব্যতীত নাকি অর্থনীতি ও সভ্যতার চাকা স্থবির হয়ে পড়বে। এ হল তাদের অভিমত। সুদ নয় যেন ক্রীতদাস প্রথার নব সংস্করণ। যে শ্রেণী সমাজ বা রাষ্ট্রসমূহকে দিয়ে এ হাতী পোষানো হয়, আর এর দ্বারা যে উপকার তারা লাভ করে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সে হাতীর খোরাকেই তা ব্যয় হয়ে যায়।

সুদদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এ প্রথা বিস্তর ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। কস্মিন কালেও গ্রহিতরা দাতাদের সম পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না। এর নজির নেই। বরং যারা সেই বড় ভাইদের, নেতাদের ও প্রভুদের খপ্পর হতে মুক্ত হয়ে কঠোর শ্রম, নিজস্ব ব্যবস্থাপনা আত্মবিশ্বাস ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে তারা বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। বঞ্চনার এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও তথাকথিত ইয়াজুজ ও মাজুজের এক হাতিয়ার। গোটাকয়েক মানুষের সুখ সাচ্ছন্দ্য ও বিলাসী জীবন নিশ্চিত করতে বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে পোষণ ও বঞ্চিত রাখা মানবতা ও সভ্যতার পরিপন্থি। তবু তারা তা অনায়াসে করে চলেছে। সুদ শয়তানের মাথা! শয়তানের মস্তিষ্কপ্রসূত এ পদ্ধতি হতে গোটা বিশ্ব যত তাড়াতাড়ি মুক্ত হবে ততই মঙ্গল। পবিত্র কুরআন বলে "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুদ খেয়ো না যা (ধন সম্পদ অনিষ্টকে) বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩১)।

বিশ্ব অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদরা যদি মাইক্রো বা ক্ষুদে সত্ত্বার পরিবর্তে মেক্রো বা বৃহৎ বিশ্বের কল্যাণ বড় করে দেখতেন তবে তাদের এ বিপর্যয় ঘটতো না। মানুষের জীবনকে সংকীর্ণ না করে গতিশীল ও আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জনের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন বলে "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর এবং যদি তোমরা মু'মিন হও তাহলে সুদের যা কিছু বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও। (বাকারা ঃ ২৭৯) "আল্লাহ্ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং দানকে সমৃদ্ধ করেন। বস্তুত আল্লাহ্ কোন কাফের পাপীকে ভালোবাসেন না। (বাকারা ঃ ২৭৭)

আমরা নিশ্চিত ইনশাআল্লাহ্, সুদপ্রথা একদিন বিলুপ্ত হবে এবং ইসলামী নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে।

এ যুগের প্রতিশ্রুত সংস্কারক ইমাম মাহ্দী (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শতভাগ খাটি অনুসারী ও তাঁর (সা.) আশেকে সাদেক এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর দীন

ইসলামকে পুন:জীবিতকারী ওসীয়্যত ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ব মানবের অর্থনৈতিক মুক্তির দ্বার উন্মোচন করেছেন। ইহা এখন সময়ের ব্যাপার। যাদের চোখ আছে তারা দেখুক, যাদের হৃদয় আছে তারা ভাবুক। সুদের বকেয়া ত্যাগ করতে অস্বীকারকারী এবং সুদ ব্যবস্থাকে জিইয়ে রাখতে যারা চাইবে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক বলেন, "এবং যদি তোমরা ইহা না কর তা হলে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ কর, কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর তা হলে তোমাদের জন্য তোমাদের মূলধন রয়েছে। (বাকারা ঃ ২৮০)

আজ আমরা চতুর্দিকে দেখি সুদের ছড়াছড়ি, এমনকি রাতারাতি বড়লোক হওয়ার এ অশুভ তৎপরতা থেকে মুসলমানরাও মুক্ত নয়। অবশ্য কিছু ইসলামী ব্যাংক তাদের প্রতিজ্ঞাকে কাজে লাগিয়ে সুদ বর্জিত ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। কিন্তু তাদের কার্যক্রম ও সীমাবদ্ধতার আবর্ত থেকে মুক্ত নয়। এ যেন হিলাশরার মতই নৈতিক ও বৈধতার পোষাক পরানোর এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

আল্লাহ্ অনুগ্রহ করুণ, আমরা যেন আল্লাহ্‌র আদেশ মান্য করে নিজেদের যত শীঘ্র পারি এ ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে মুক্ত করি।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর

সুদ একটি অভিশাপমালা যা পরিধান করলে রেহাই পাওয়া অসম্ভব

ইসলাম সুদকে হারাম আখ্যা দিয়েছে। যে ব্যক্তি কারো কাছ থেকে সুদ গ্রহণ করে বা প্রদান করে যদিও তা কম হোক বা বেশি সে অভিশপ্ত। আর যে ব্যক্তি সাক্ষী হবে সেও অভিশপ্ত। সুদ এমন একটি অভিশাপের মালা, যদি কারো গলায় তা পড়ে যায় তাহলে তার এর থেকে রেহাই পাওয়া বা এর থেকে বেড়িয়ে আসা অসম্ভব।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, যদি কারো পিতা সুদের ওপর টাকা নিয়েছেন তো তিনি সুদ দিতে দিতেই মরে গিয়েছেন। কিন্তু আসল টাকাও পরিশোধ করে যেতে পারেন নাই। তারপর তার সন্তানরাও (সুদ) দিতেই থাকল, কিন্তু তারাও পরিশোধ করতে পারলো না। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সুদের অভিশাপ থেকে বঁচানোর জন্য সুদকে হারাম করে দিয়েছেন। আর বলেছেন, যে মুসলমান সুদ নেয় বা দেয় সে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করে। আর প্রত্যেক বুদ্ধিমান এটা জানে যে আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূলের সাথে মোকাবেলা করে কোন ব্যক্তি কখনও কামিয়াব হয়নি বা হতে পারেও না। কিছু সংখ্যক লোক বলে থাকে যে, সুদ ছাড়া চলা সম্ভব নয়। এটা ভুল কথা। আর এটি একটি শয়তানী প্ররোচনা ছাড়া কিছুই না। যদি কেউ নেক নিয্যতে সুদ ছাড়াও চলতে চায় তাহলে নির্দ্বিধায় চলতে পারবে।

তবে হ্যা, যদি নিরুপায় হয়ে সুদ নিতে হয়, যেমন কোন ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা করে তবে সেই ক্ষেত্রে সুদ অবশ্যই পাওয়া যায়। এমন ব্যক্তির উচিত হবে যে, প্রাপ্ত সুদের টাকা নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার না করে বরং আমাদের জামা'তের যে "ইশায়াতে ইসলাম ফান্ড" আছে সেখানে দিয়ে দেয়া। কেননা সুদের টাকা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা হারাম। অনেকেই এমন আছে যারা ব্যাংকে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা রাখে এই আশায় যে, মাস শেষে বা বছর শেষে অথবা পাঁচ বছর পর কিংবা দশ বছর পর ব্যাংক থেকে যে লাভ আসবে বা যে সুদ আসবে তা দিয়ে আমি আমার সংসারকে সুন্দরভাবে চালাতে পারবো। এমন ব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেই দিয়েছেন, সুদের একটি পয়সাও নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে না।

কেউ যদি ভাল নিয়্যত নিয়ে ব্যাংকে বা অন্য কোথাও টাকা জমা রাখে যে সুদের সমুদয় টাকা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় দিয়ে দিব। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা ঐ ব্যক্তির আসল টাকার মধ্যে অসাধারণ বরকত ঢেলে দিতে পারেন বা দিয়ে থাকেন যা তারপক্ষে কল্পনাও করা সম্ভব নয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন–যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত এক শস্য বীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্য বীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যার জন্য চান (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করে দেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী সর্বজ্ঞানী। (আল কুরআন)

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল সদস্যকে সুদ মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মৌ. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, গাজীপুর

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"শীতে অসহায়দের সেবায় আমাদের করণীয়।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ৫ জানুয়ারী, ২০১৫-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বি: দ্র: পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com,
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ নভেম্বর, ২০১৪ তারিখ রোজ শনিবার বাদ-মাগরিব মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে আহমদী পাড়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত জলসায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জনাব মোহাম্মদ আল-আমীন, জেলা নাযেম, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ব্রাহ্মণবাড়িয়া। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম আরম্ভ হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব নাসির আহমদ এবং নযম পাঠ করেন জনাব এজাজ আহমদ।

মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর মানব প্রেম প্রসঙ্গে আলোচনা করেন জনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ আবু তালেব, যয়ীমে আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ (সা.)-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখেন মৌ. আবু তাহের, মোয়াল্লেম। মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত জলসায় মোট ১১৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আবু তালেব

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ২১-১১-২০১৪ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের ভাইস প্রেসিডেন্ট দিলরুবা বেগম মায়ার সভানেত্রীত্বে দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন খাদিজা বেগম তুষ্টি। নযম আবৃত্তি করেন সুরাইয়া নাছের তুলি ও খাওলাদীন উপমা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে 'সীরাতুন নবী (সা.) জলসার গুরুত্ব ও তাৎপর্য' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন সাদিয়া সালমা স্বর্ণা। 'ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূল প্রেম' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন আফরীন আহমদ হিয়া, 'হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত' এ নিয়ে বক্তব্য রাখেন সুরাইয়া নাছের তুলি। 'বিদায় হজ্জের ভাষন' নিয়ে বক্তৃতা করেন সুলতানা নাছিরা। 'নিজ বিবিগণের প্রতি হযরত রসূল করীম (সা.)-এর আচরণ' এ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন উম্মে কুলসুম চায়না।

সভানেত্রীর বক্তব্যের পর দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ৩৮ জন লাজনা, ১০ জন নাসেরাত ও ৬ জন শিশু এবং কয়েকজন মেহমান উপস্থিত ছিলেন।

মাসুদা পারভেজ

ফতুল্লা জামা'তের বিশেষ তালিম-তরবিয়তী সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৪/১১/২০১৪ শুক্রবার বিকাল ৪ ঘটিকা হতে ফতুল্লা জামা'তের 'ফতুল্লা হালকায়' জনাব নজরুল ইসলাম সরকার সাহেবের বাসায় অত্র জামা'তের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম মোস্তফা সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিশেষ তালিম তরবিয়তী সভা ও দরসে কুরআন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শোয়েব আহমদ হাওলাদার, বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব ডাঃ নাজমুল ইসলাম সরকার। এরপর হুযূর (আই.)-এর দিকনির্দেশনার আলোকে নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন জনাব কাজী মোবাশ্বের আহমদ, সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত, ফতুল্লা। পবিত্র কুরআন থেকে দরস প্রদান করেন মৌলবী এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে দোয়ার মাধ্যমে সভা শেষ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক রনি

তেজগাঁও জামা'তে হুযূর আনওয়ার (আই.) প্রদত্ত Ebola Virus-এর প্রতিষেধক বিতরণ

গত ২১ নভেম্বর ও ২৮ নভেম্বর ২০১৪ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেজগাঁও-এর উদ্যোগে বাদ জুমুআ বিনামূল্যে তেজগাঁও জামা'তের সকল সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয় হুযূর আনওয়ার (আই.) প্রদত্ত Ebola Virus-এর প্রতিষেধক। বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম সাহেব সকল সদস্যদের মাঝে এই প্রতিষেধক বিতরণ করেন। জামা'তের সকলে অত্যন্ত আগ্রহ ভরে তা গ্রহণ করেন এবং শুকরিয়া আদায় করেন।

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াদুদ

হবিগঞ্জে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত

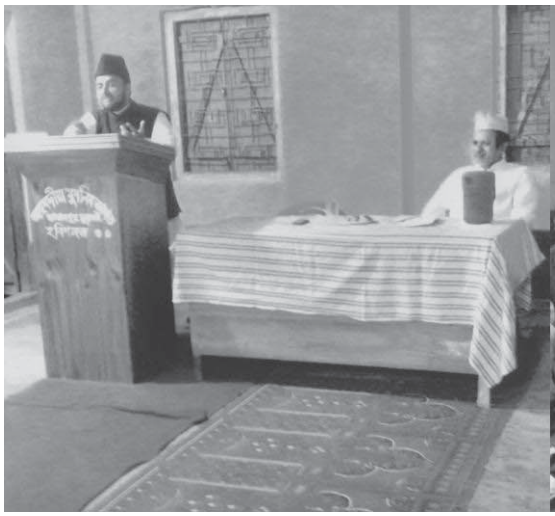

গত ১৫/১১/২০১৪ তারিখ বাদ মাগরিব মজলিস আনসারুল্লাহ্ জামালপুর (হবিগঞ্জ)-এর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও তবলিগী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব আব্দুল জলিল এবং মওলানা সোলায়মান সুমন জ্ঞানগর্ব বক্তৃাত প্রদান করেন। এতে ৩৩ জন জেরে তবলীগ এবং ২৭ জন আহমদীসহ মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিগণ খুব সুন্দরভাবে মেহমানদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। জেরে তবলীগণ কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের ভাষণের প্রশংসা করেন এবং তারা খুবই প্রভাবিত হন।

তৌফিক আহমদ চৌধুরী

উথলী জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ২৮ নভেম্বর ২০১৪ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিস আনসারুল্লাহ্ উথলী সন্তোষপুরের উদ্যোগে বিশেষ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা জনাব মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান, যয়ীম, মজলিস আনসারুল্লাহ্ উথলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব সিরাজুল ইসলাম, নযম পাঠ করেন জনাব আমিনুজ্জামান। 'হযরত নবী করীম (সা.)-এর সীরাতের বিভিন্ন দিক' নিয়ে আলোচনা করেন জনাব রফিকুল ইসলাম। 'মহানবী (সা.)-এর বাল্য জীবন' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব সালাউদ্দিন। 'নসিয়তমূলক' বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গফুর। 'তরবিয়তমূলক' বক্তব্য রাখেন মৌ. মোজাফ্ফর আহমদ। 'মহানবী (সা.)-এর ইসলাম প্রচার' এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ খালিদ হোসেন সবুজ।

উক্ত সীরাতুন নবী জলসায় উথলী, সন্তোষপুর, চুয়াডাঙ্গা, শৈলমারী ও বটিয়াপড়ার সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার সমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ শাহিনুর রহমান

তেরগাতী জামাতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতীর উদ্যোগে গত ২৪/১১/২০১৪ তারিখ রোজ সোমবার সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আনোয়ার আলী সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত জলসার অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মৌ. আব্দুল মান্নান। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব মাসরূর আহমদ উৎস। বক্তৃতা পর্বে 'হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর জীবনাদর্শ' সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট, তেরগাতী। 'মানবতা প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)' এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মাওলনা জাহিদুল ইসলাম শুভ, মুরব্বী সিলসিলাহ। এ পর্যায়ে বাংলা নযম পরিবেশন করেন টিপু সুলতান। এরপর 'হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর রসূল প্রেম' সম্পর্কে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ রাসেল সরকার, মুরব্বী সিলসিলাহ। পরিশেষে প্রশ্নো-উত্তর পর্ব শুরু হয়। সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়। উক্ত জলসায় ৬জন মেহমানসহ ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়্যদ তোফায়েল আহমদ

দোয়া প্রার্থী

আমার বড় মেয়ে আফিফা পারভীন শান্তা। এ বছর ২০১৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে আল্লাহ্‌র রহমতে এবং হুযূর (আই.) এবং আপনাদের দোয়ার বরকতে ফ্যাকাল্টি অফ ফার্মেসীতে (Phermacutical Chemistry)-তে এম ফার্ম ৪র্থ স্থান লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্।

সে কৃতিত্বের সাথে বৈজ্ঞানিক ঘবেষণামূলক নিবন্ধ ২০০ পৃষ্ঠার একত্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছে। যা অত্যন্ত সম্মানের সাথে গৃহিত হয়েছে। সে আগামিতে আরও উন্নততর কৃতিত্বের জন্য ও জামা'তের সাথে অধিকতর সম্পৃক্ততার জন্য সকলের কাছে খাস দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়া প্রার্থী

আনিসুর রহমান (খোকন)

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৫তম স্থানীয় ইজতেমা সফলতার সাথে সমাপ্ত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৫তম স্থানীয় ইজতেমা গত ৩০ শে অক্টোবর ২০১৪ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার জনাব এস এম ইব্রাহীম রিজিওনাল কায়েদ, চট্টগ্রাম রিজিওন এর সভাপতিত্বে আহমদী পাড়া বায়তুল ওয়াহেদ-এ অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ মঞ্জুর, নযম পেশ করেন জনাব সোলায়মান আহমদ। সভায় পর্যায়ক্রমে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জনাব এখতিয়ার উদ্দিন শুভ-কায়েদ এবং মৌ. আবু তাহের, মোয়াল্লেম। সভাপতির ভাষণের পর ইজতেমার প্রতিযোগিতার পর্ব আরম্ভ হয়। রাত ৮ টা হতে ১০টা পর্যন্ত এমটিএ-তে সরাসরি সম্প্রচারিত সত্যের সন্ধান অনুষ্ঠান উপভোগের পর ইজতেমার পরবর্তী কর্মসূচী ৩১ শে অক্টোবর বাদ ফজর আরম্ভ হয়। ইজতেমায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে ছিলেন সর্বজনাব মোস্তাক আহমদ খন্দকার, এস এম আবু তাহের, আবু তালেব, কাউসার আহমদ মঞ্জুর, সালাহ উদ্দিন আহমদ, শেখ সাব্বির আহমদ উজ্জ্বল, জুয়েল আহমদ প্রমুখ। বাদ জুমুআ জনাব ডা. মনিরুল ইসলাম স্বপন, নায়েব সদর-১, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব ইকবাল হুসেন খোকন। এরপর সভাপতি সদর সাহেবের দিক-নির্দেশনার আলোকে বক্তব্য রাখেন। এরপর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জনকারীগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ শেষে সভাপতি আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন। এতে খোদ্দাম ৮৭ জন, আতফাল ১১৩ জন ইজতেমায় যোগদান করেন। ইজতেমার সমাপনী অনুষ্ঠান আহমদীপাড়ার প্রায় ৫০টি এমটিএ সংযোগে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

দেলোয়ার হুসেন মুন্না

শোক সংবাদ

আমরা অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় আম্মা মরহুম আব্দুল মজিদ সাহেবের স্ত্রী মোছাম্মত জরিমুন্নেসা বেগম সাহেবা গত ১৫ই নভেম্বর ২০১৪ বিকাল ২.৩০টার সময় প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ২৭৫ পূর্ব নাখালপাড়া ঢাকার নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুমা ৪ ছেলে, ৪ মেয়ে এবং নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

মরহুমা নিয়মিত নামায তাহাজ্জুদ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিষ্ঠার সাথে আদায় করতেন। তিনি খুবই পরহেজগার, মেহমান-নেওয়াজ ও সদালাপী ছিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের সাথে তার আচরণ ছিল ভালো। এছাড়া প্রতিবেশীর কোন বিপদ-আপদ দেখলে তাদের সহযোগিতার জন্য ঝাপিয়ে পড়তেন। মরহুমা মৃত্যুর পূর্বে নাখালপাড়া মসজিদের তিন তলা নির্মাণ কাজের জন্য তার পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা দেয়ার ওসিয়্যত করে যান। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট আমাদের আম্মার মাগফেরাতের জন্য ও শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে যেন সাবরে জামিল দান করেন সেজন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মরহুমার বড় ছেলে
নাজির আহমদ
ঢাকা, নাখালপাড়া হালকা

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব আব্দুল বারীক, পিতা মরহুম আমজাদ আলী প্রধান গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ভোর ৪ টার সময় প্রায় ৯৫ বৎসর বয়সে নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তিনি দীর্ঘদিন থেকে বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুম ৫ মেয়ে এবং নাতি-নাতনী ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

মরহুম খুবই পরহেজগার, মেহমাননেওয়াজী ছিলেন। আহমদীয়াতের জন্য তিনি তৎকালীন ন্যাশনাল আমীর সাহেব-এর নির্দেশে কটিয়াদির হালুয়াপাড়া থেকে ১৯৫৩ সালে হিজরত করে পঞ্চগড় জেলার শালশিড়ীতে বসতি স্থাপন করেন। তিনি দীর্ঘদিন শালশিড়ীর মহল্লা প্রেসিডেন্ট-এর দায়ীত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এছাড়া শালশিড়ী মসজিদের জমি ক্রয় ও কবরস্থানের জমিক্রয়ের সময় তিনি বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেন। তিনি যুগ খলীফা ও নেযামের আনুগত্যকারী এক সেবক ছিলেন।

মরহুম জামা'তের যে কোন নির্দেশের ওপর আমল করতেন এবং নিয়মিত চাঁদা দিতেন। আমাদের ছোট বয়সেই আমাদের পিতা মৃত্যুবরণ করেন, তাই পিতার স্থলে এই ভাই আমাদেরকে উত্তম তরবিয়ত দিয়ে এবং পড়া লেখা শিখিয়ে মানুষ করেন। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের নিকট আমাদের বড় ভাই-এর মাগফেরাতের জন্য ও শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে যেন সাবরে জামিল দান করেন সেজন্য দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

মরহুমের ছোট ভাই
সহিদ আহমদ
আহমদনগর,পঞ্চগড়

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

(এমটিএ-তে সম্প্রচারিত)

হুযূর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর ২০১৪) লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) সূরা নিসার ৬০ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন যাতে আল্লাহ্ বলেছেন, "*হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর, তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্তৃপক্ষেরও আনুগত্য কর। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সাথে কোন বিষয়ে তোমরা মতভেদ করলে এ বিষয়টি আল্লাহ্ ও রসূলের সমীপে উপস্থাপন কর, তোমরা যদি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখ। এ হলো সর্বোত্তম পন্থা এবং পরিণামের দিক থেকে সবচেয়ে ভাল।*"

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সত্যিকার আনুগত্য করলে মানুষের হৃদয়ে এক প্রকার জ্যোতি সৃষ্টি হয় এবং আত্মা এক প্রকার স্বাদ পায়। চেষ্টা-সাধনার ততটা প্রয়োজন নেই যতটা প্রয়োজন আনুগত্যের।

হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের পর প্রশাসনের আনুগত্য আবশ্যক। যদি তারা শরীয়তের সুস্পস্ট শিক্ষার বিরুদ্ধে কোন নির্দেশ না দেয় তাহলে দেশীয় আইনের প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। হায়! আজ যদি মুসলমানরা এই স্বর্ণালী নীতিটি মেনে চলতো তাহলে বিশ্বে বিরাজমান নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা হতে তারা রক্ষা পেত।

এরপর হুযূর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখা হতে একটি অংশ পাঠ করেন যাতে আনুগত্যের গুরুত্ব, এর কল্যাণ এবং এই বৈশিষ্ট্য যারা অবলম্বন করে তারা কীরূপ উন্নত গুণে সমৃদ্ধ হয় তার বিবরণ রয়েছে।

হুযূর (আই.) বলেন, খোদা ও রসূলের আনুগত্যের পর দেশীয় আইন মেনে চলা আবশ্যক আর এর মধ্যে জামা'তের ব্যবস্থাপনাও অর্ন্তভুক্ত। 'উলিল আমর' বলতে বাহ্যিক অর্থে সরকার বা প্রশাসন আর আধ্যাত্মিক অর্থে খলীফা। তাই সবার জন্য নিঃশর্তে খিলাফতের আনুগত্য আবশ্যক। আর খলীফা নিজেও যেহেতু দেশীয় আইনের প্রতি পূর্ণরূপে শ্রদ্ধাশীল, তাই তিনি তার অনুসারীদেরও এই আনুগত্যের শিক্ষা দেন।

হুযূর (আই.) বলেন, আহমদীদের প্রতি খোদার অনেক বড় অনুগ্রহ। কেননা, আমাদের মাঝে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান। এজন্য আহমদীরা খোদার প্রতি যত কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করুক না কেন তা যথেষ্ট নয়। তবে, মানুষ নিজেকে যাচাই করে দেখতে পারে, যদি তার হৃদয়ে জ্যোতি সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝা যাবে যে, সত্যিকার অর্থেই সে আনুগত্য করছে।

হুযূর বলেন, বয়আতের অর্থ হচ্ছে, নিজেকে বিক্রি করে দেয়া। আমাদের নিজেদের সকল চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করতে হবে। নতুবা বড় বড় একত্ববাদীর হৃদয়েও অনেক সময় অহংকারের প্রতিমা বাসা বাঁধে। আর যারা আনুগত্যের গন্ডি হতে বের হয়ে যায় তারা এর সীমাহীন কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীগণ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও হুযূর পাক (সা.)-এর সামনে তাঁরা নতশীরে বসে থাকতেন। আর এরূপ আনুগত্যের ফলেই তাঁরা ইবাদতের সুফল লাভ করেছেন। খোদার দরবারে সম্মানের আসনে আসীন হয়েছেন।

মহানবী (সা.) বলেছেন, "কোন হাবশী গোলামও যদি তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয় আর তার মাথা যদি শুকনো কিশমিশের মতোও হয় তবুও তোমরা তার আনুগত্য করবে"।

খোদা তা'লা বলেছেন, তোমরা তাঁর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখো যাতে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারো। জাতিগত উন্নতির রহস্য নিহিত আছে এই আনুগত্যের মাঝে। আজ মুসলমানরা যদি এটি বুঝতে পারতো তাহলে এমন শক্তিতে রূপান্তরিত হতো যে, বিশ্বের কোন শক্তিই মুসলমানদের সাথে টক্কর দেয়ার সাহস করতো না। আর আনুগত্য না থাকলে পতন ও ধ্বংস অনিবার্য। আর এই অবস্থাই আজ মুসলমান দেশগুলোতে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। মনে রাখবে, আনুগত্য করলে পরিণাম শুভ হবে আর বিপ্লব অনিবার্য হবে।

জাগতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে হুযূর (আই.) নেপোলিয়ানের সেনাবাহিনীর কথা বলেন। এরপর বলেন, নেপোলিয়ান বা তার মত জাগতিক নেতাদের সঙ্গে খোদার সাহায্যের কোন প্রতিশ্রুতি ছিল না যা রয়েছে খোদার মনোনীতদের সঙ্গে। তাই মানুষ সফল হতে চাইলে যুগ ইমামের আনুগত্য তার জন্য একান্ত আবশ্যক। কেননা, খোদার হাত জামা'তের ওপর থাকে।

খুতবার শেষে দিকে হুযূর (আই.) বলেন, আমাদের কাছে উলিল আমরের যে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে আমরা যেন তার পূর্ণ আনুগত্য করতে সক্ষম হই। আমাদের এবং অন্যদের মাঝে যেন একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। আহমদীরা, এমন আদর্শে পরিণত হোন যাতে বিশ্বের দৃষ্টি আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর আমরা যেন এই আদর্শের কল্যাণে বিশ্ববাসীকে খোদা ও তাঁর রসূলের চরণতলে সমবেত করতে সক্ষম হই। আল্লাহ্ করুন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজ জামা'তের কাছে যে প্রত্যাশা রেখেছেন আমরা যেন তা পূর্ণ করতে সক্ষম হই, আমীন।

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) প্রদত্ত ২৮ নভেম্বর ২০১৪-এর জুমুআর খুতবার সারমর্ম।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভাষায় তিনি বলেন, মানুষের সকল প্রয়োজন এবং কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে একমাত্র খোদার সত্তাই সাহায্য করতে পারেন।

সাধারণ মানুষ বলে, আল্লাহ্‌র কৃপায় আমার এই কাজ সমাধা হয়েছে কিন্তু তাদের একথা শুধুই বুলি সর্বস্ব। তাদের অন্তরের গভীরে উঁকি মেরে তাকালে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন উপকরণ ও ব্যক্তিকে এই কাজ সম্পাদনের কৃতিত্ব দিয়ে থাকে।

অনেক সময় মানুষ নিজের সমস্যা সমাধানের জন্য পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কোন জাগতিক সংগঠন বা মানবাধিকার সংগঠনের দ্বারস্থ হয় এবং নিজেদের কাজ সমাধা হয়ে গেলে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং মনে মনে ভাবে, এদের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক ছিল বলেই আজ এরা আমার কাজে এসেছে আর তাদের সাহায্যে আমার প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেছে।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ সমস্যার সম্মুখীন হলে মনে করে আমার শক্তি, জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আমি এথেকে মুক্ত হবো, এবং যখন সে বিপদমুক্ত হয় তখন ভাবে আমার যোগ্যতা, শক্তি ও জ্ঞানই আমাকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। আর এ নিয়ে সে অহংকার করে।

কিন্তু যখন জাগতিকভাবে কারো কাছ থেকে আর কোন সাহায্যের আশা থাকে না তখন মানুষ নিরূপায় হয়ে খোদার সত্তার প্রতি ভরসা করে। আর শুধুমাত্র বিশ্বাসীরাই নয় বরং নাস্তিক এবং পৌত্তলিকরাও বিপদে পড়লে খোদাকে ডাকতে আরম্ভ করে। আর খোদা তাদের ডাক শুনে তাদের সাহায্যার্থে এগিয়েও আসেন।

এক্ষেত্রে হুযূর কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন, সমুদ্রে যখন মানুষ বিপদের সম্মুখিন হয় তখন সে সাহায্যের আশায় খোদাকে ডাকতে থাকে। আর খোদার সাহায্যে যখন সে নিরাপদে তীরে পৌঁছে যায় তখন সে আবার খোদাকে ভুলে যায়। বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

হুযূর (আই.) একজন হিন্দু নাস্তিক যে খোদা অস্তিত্ব নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতো তার উদাহরণ দিয়ে বলেন, চরম বিপদের সময় তার মুখ থেকেও রাম রাম শব্দই উচ্চারিত হয়। আবার বিশ্বযুদ্ধের পরাজয় চোখের সামনে দেখতে পেয়ে বড় বড় কমান্ডারও খোদার দরবারে নতশীরে সাহায্য প্রার্থনা করে। আর তাদের এই প্রার্থনা কবুল করে খোদা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। কারণ, খোদা স্বয়ং বলেছেন, ব্যাকুল চিত্তের দোয়া তিনি গ্রহণ করেন, তা-সে আস্তিক-নাস্তিক যে-ই করুক না কেন। খোদা অনেক সময় ঘোর নাস্তিকের দোয়াও কবুল করেন এবং তাকে নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দেন। খোদা পরম দয়ালু! তিনি জানেন যে, বিপদমুক্ত হবার পর বান্দা আমাকে ভুলে যাবে তারপরও তিনি বান্দার আহ্বানে সাড়া দেন এবং তাকে সাহায্য করেন। কারণ তিনি মানুষের স্রষ্টা এবং পরম দয়ালু।

কিন্তু যারা সত্যিকার বিশ্বাসী। তারা নিজেদের সকল কর্মকান্ডের সফলতার পিছনে খোদার শক্তিশালী হাত কাজ করছে বলে মনে করেন। বাহ্যত কোন মানুষ সহযোগিতা করলেও তারা মূলত খোদার নির্দেশেই অপরের সাহায্য করে থাকেন।

কাজেই, আমরা যারা এ যুগে নিজেদের সত্যিকার মুসলমান হিসেবে দাবী করি, আমাদের জাগতিক কোন উপায়-উপকরণের ওপর নির্ভর না করে শুধুমাত্র খোদার সত্তার ওপরই ভরসা করা এবং আস্থা রাখা উচিত। জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহার করা অন্যায় নয় বরং সাধ্যমতো চেষ্টা করা উচিত কিন্তু এর ওপর নির্ভর না করে খোদার সত্তায় নির্ভর করা উচিত। শুধু বিপদের সময় আকুতি মিনতি করে খোদাকে না ডেকে সর্বদা খোদার স্মরণে রত থাকা উচিত। যেমনটি খোদা আমাদেরকে প্রত্যেক দিন পাঁচবেলার নামাযের প্রত্যেক রাকাতে এই দোয়া শিখিয়েছেন, হে খোদা! "আমরা তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি"। যখন আন্তরিকভাবে বান্দা এই দোয়া করে তখন তাকে সাহায্য করা খোদার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী! বান্দার উচিত বার বার দোয়া করা এবং অধিকহারে তাঁকে ডাকা, নতুবা আল্লাহ্ ভ্রুক্ষেপহীন।"

হুযূর (আই.) খুতবার শেষ দিকে বিশ্ব জামা'তে আহমদীয়াকে দোয়ার বিষয়ে অধিক যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্বের চলমান পরিস্থিতি যতদ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা যেন আমাদের জামা'তের উন্নতির কারণ হয়। জামা'তের উন্নতির পথে যেন কোনরূপ অন্তরায় সৃষ্টি না করে, এজন্য আপনারা বেশি বেশি দোয়া করুন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়ার গুরুত্ব ও মর্ম অনুধাবন করে সে মোতাবেক আমল করার তৌফিক দিন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

যশোরে আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন

Natoinal Amir Alhaj Mobasherur Rahman Sahib delivering his Inaugural speech

আল্লাহ্ তা'লার অসীম অনুগ্রহে গত শুক্রবার ১২ই ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে যশোর সদরের উপশহরে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক নবনির্মিত আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। শ্রদ্ধেয় জনাব ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মোবাশ্বেরুর রহমান এই মসজিদটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। হুযুর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এই মসজিদের নাম রেখেছেন 'মসজিদে মাহমুদ'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন অত্র জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোশার্‌রফ হোসেন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর তৃতীয় ও সেক্রেটারী জায়েদাদ জনাব আলহাজ্ব মোহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ, মসজিদের নির্মাণব্যয় বহনকারীদের পক্ষ থেকে জনাব মোহাম্মদ আলী রাজপুত, চুয়াডাঙ্গা থেকে আগত জনাব মাষ্টার আব্দুল গফুর, এনজিও ফোরামের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সমাজসেবী এডভোকেট নবী নওয়াজ মোহাম্মদ মুজিবুদ দৌলা সরদার (কনক), 'এডাবের' পক্ষ থেকে জনাব শাহজাহান নান্নু, প্রতিবেশী শ্রমিকনেতা জনাব মোহাম্মদ আলী এবং যশোর আহমদীয়া জামা'তের পুরোন সদস্য জনাব জুলফিকার আলম। আশেপাশের অন্যান্য স্থানীয় জামা'তের প্রতিনিধিবর্গ এবং স্থানীয় জামা'তের সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়া অ-আহমদী মুসলমানদের একটি বড় অংশও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মরহুম চৌধুরী ইদ্রিস আহমদ অফ রাবওয়ার পক্ষ থেকে একটি স্থায়ী নেকী হিসেবে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর পুত্র চৌধুরী তাহের আহমদ এই মসজিদের সম্পূর্ণ নির্মাণ ব্যয় বহন করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমকে এবং তাঁর পরিবারের সবাইকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন। এই মসজিদটি নির্মাণের পেছনে অন্যান্যদের সাথে নিয়ে বিশেষভাবে নিরলস পরিশ্রম করেছেন মোয়াল্লেম জনাব এহতেশামুল বশীর। তাঁর জন্য এবং তাঁর পরিবারের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে। যে বা যারাই এই মহতি কাজে নিজ নিজ গণ্ডিতে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের সবার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। এই মসজিদ নির্মাণ বাংলাদেশের আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী উদযাপন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রকল্প। ইতোপূর্বে মসজিদের পাশেই একটি ইমাম কোয়ার্টারস নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'লা এই মসজিদটিকে গোটা অঞ্চলের জন্য একটি আধ্যাত্মিক বাতিঘর বানিয়ে দিন, আমীন।

Mohammad Ali Rajput Sahib speaking on behalf of the doner family

President of Ahmadiyya Muslim Jama'at Jessore Janab Musharraf Hussain Sahib speaking at the inauguration ceemony

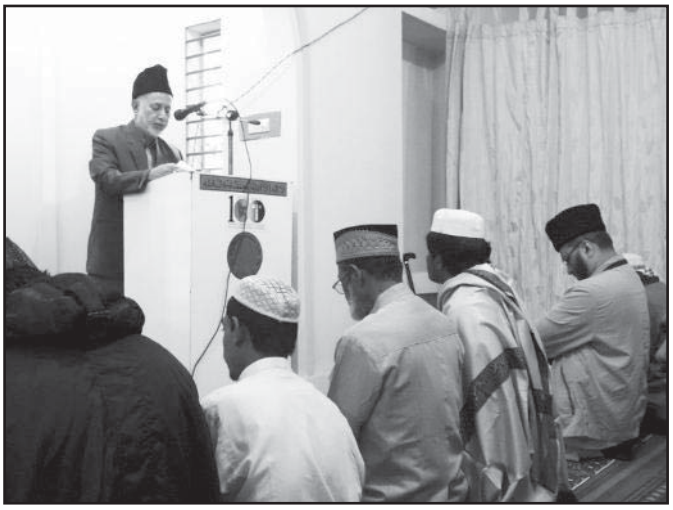

Friday Sermon delivered by Janab National Amir Sahib at Masjid e Mahmud Dec 12, 2014

Janab Alhaj Muhammad Faizullah Sahib Naieb National Amir 3 and Secretary Jaidad speaking on the occassion

NGO Forum leader Janab Kanak delivering his speech on the occassion

ADAB coordinator Janab Shah Jahan Nannu addressing the audience

Janab Master Abdul Gafur Sahib speaking on the occassion

Janab Julfikar Alam Sahib speaking on the occassion

সুধি দর্শক-শ্রোতা! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, দর্শকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে সরাসরি সম্প্রচারিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনপ্রিয় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান 'সত্যের সন্ধানে' এমটিএ লন্ডন স্টুডিও এবং এমটিএ বাংলাদেশ স্টুডিও থেকে আবারো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্। আসছে ২৫ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত টানা ৪ দিন এই অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ করে সারা বিশ্বের বাংলাভাষী সকল আহমদী ভাই-বোনদেরকে এই সাড়াজাগানো জ্ঞানগর্ভ অনুষ্ঠানটি পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সহকর্মী মেহমানদের নিয়ে দেখার, সরাসরি অংশগ্রহণ করার এবং এর সার্বিক সফলতার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে যে সকল মেহমানদের সাথে আপনারা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সু-সম্পর্ক স্থাপন করেছেন তাদেরকেও এ অনুষ্ঠানে নিয়ে আসবেন।

দিন ও তারিখ	বাংলাদেশ সময়	জিএমটি	ব্যপ্তিকাল
বৃহস্পতিবার ২৫/১২/২০১৪	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
শুক্রবার ২৬/১২/২০১৪	রাত ৮.৩০ থেকে	১৪.৩০	২ ঘন্টা
শনিবার ২৭/১২/২০১৪	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা
রবিবার ২৮/১২/২০১৪	রাত ৮.০০ থেকে	১৪.০০	২ ঘন্টা

আপনার প্রশ্ন পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.tv

অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখার জন্য লগ-ইন করুন ঃ

www.mta.tv

অনুগ্রহ পূর্বক ভিজিট করুন আমাদের সত্যের সন্ধানের ইউটিউব চ্যানেল:

www.youtub.com/shottershondhane

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 77 | 11th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th December, 2014 Tk. 20.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, www.alislam.org, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com